এক অসহায় কন্যার আর্তকথা

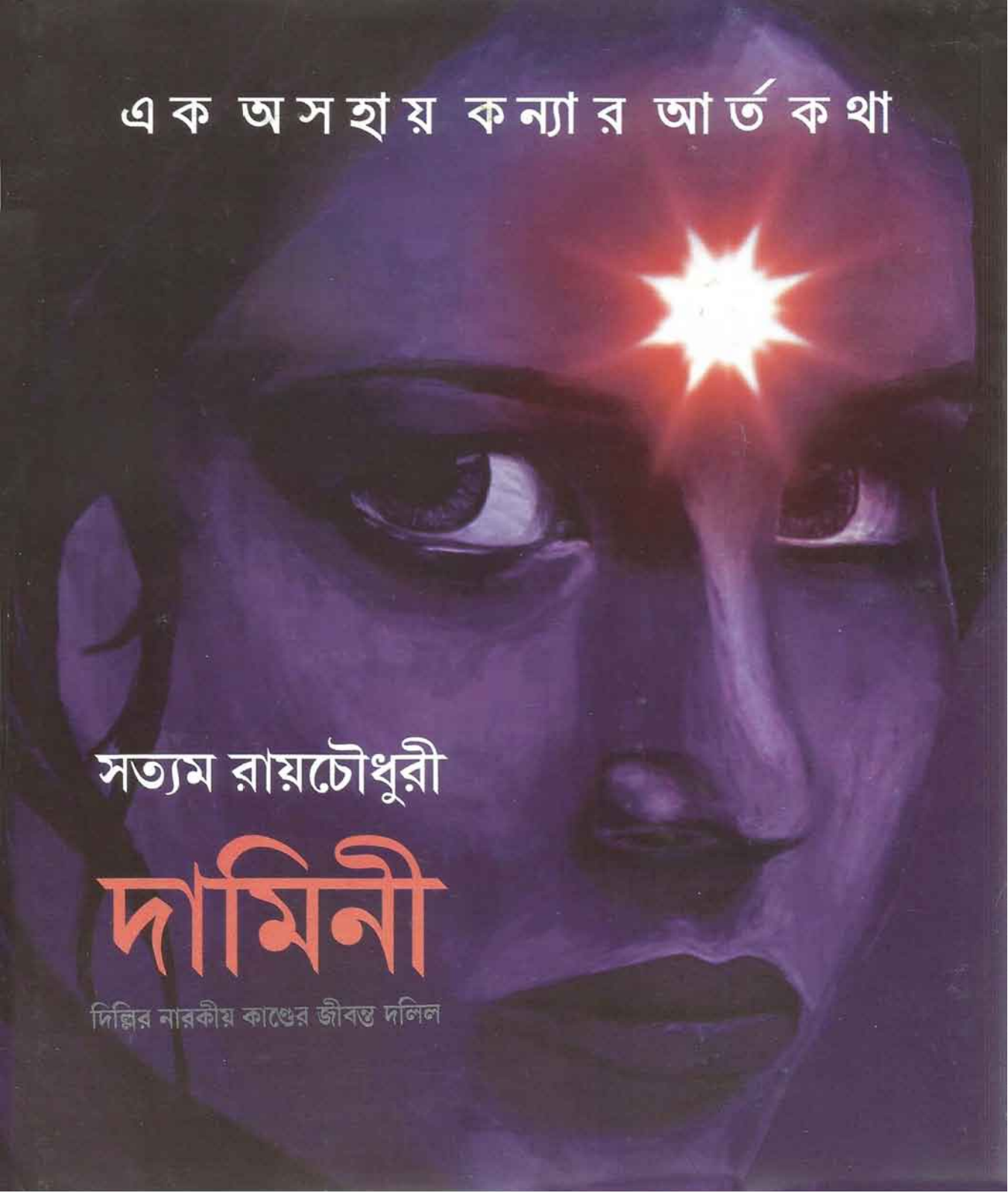

সত্যম রায়চৌধুরী

দামিনী

দিল্লির নারকীয় কাণ্ডের জীবন্ত দলিল

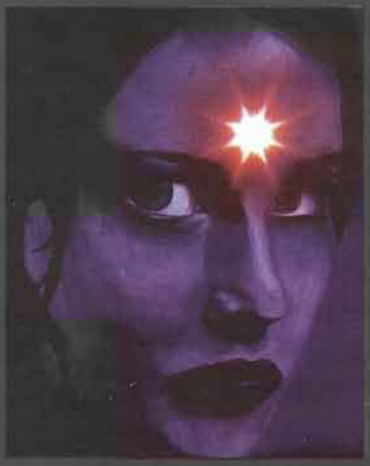

'মা, ম্যাঁয় জিনা চাহতি হুঁ।'

হাসপাতালের বেডে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষতে থাকা অসহায় মেয়েটির সেই আর্তস্বর সারা ভারতবর্ষের আবালবৃদ্ধবনিতার বুকে বিঁধে আছে। প্রতিবাদ, আন্দোলনের ঢেউ ওঠে আসমুদ্র-হিমাচলে।

সত্যম রায়চৌধুরীও সেই তীব্র যন্ত্রণার শরিক। যিনি একাধারে গভীর সংবেদনশীল, সাহিত্যসেবী ও সংস্কৃতিমনস্ক মানুষ।

দামিনীর জীবন যন্ত্রণা ও লড়াই নিয়ে তাঁর তথ্য ও দুর্লভ ছবিতে সমৃদ্ধ এই গ্রন্থ একাধারে যেমন পৃথিবীর সব মানুষের মনের কথা, তেমনই এর ছত্রে-ছত্রে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে মেয়েটির আর্ত-কথা, উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে দামিনীর জ্যোতি। মানবিকতা মৃত্যুহীন, দানবিকতার বিরুদ্ধে তার সংগ্রাম আবহমানকালের।

দামিনী

সত্যম রায়চৌধুরী

দামিনী

পত্র ভারতী

প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৩
পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ মার্চ ২০১৩

DAMINI
Real life story of a rape-victim
by
Satyam Roychowdhury

ISBN 978-81-8374-193-4

প্রচ্ছদ
মানস চক্রবর্তী

মূল্য
১০০.০০

Publisher
PATRA BHARATI
3/1 College Row, Kolkata 700 009
Phones 2241 1175, 94330 75550, 98308 06799
e-mail : patrabharati@gmail.com
website : www.bookspatrabharati.com
Price ₹ 100.00

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পত্র ভারতী, ৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে প্রকাশিত
এবং হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

দামিনীকে

পত্র ভারতী থেকে প্রকাশিত লেখকের অন্য বই

কবিতীর্থ বিলেত

কে এই দামিনী?

দামিনী কোনও একটি মেয়ের নাম নয়। নির্ভয়া কোনও একটি মেয়ের নাম নয়। জ্যোতিও কেবলমাত্র একটি মেয়ের নাম নয়। অসহায়ভাবে নরপশুদের লালসার শিকার হয়েও দুনিয়ার যে মেয়ে লড়তে লড়তে প্রাণ হারায়, সেই তো দামিনী, নির্ভয়া কিংবা জ্যোতি। তাদের যন্ত্রণার কথা, অসহায় ভাবে মরে যাওয়ার কথা, অত্যন্ত সমবেদনার সঙ্গে সত্যম রায়চৌধুরী তুলে ধরেছেন তাঁর লেখনীতে। সাম্প্রতিক দিল্লি গণধর্ষণকাণ্ডের যেন একটি দলিল রচনা করেছেন তিনি। মূর্ত হয়ে উঠেছে অকালে জীবনদীপ নিভে যাওয়া মেয়েটির স্বপ্নভঙ্গের কাহিনি। তার পরিবারের বেদনা, হতাশা, ক্ষোভ। আসমুদ্র হিমাচলের তীব্র প্রতিক্রিয়াও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লিপিবদ্ধ করেছেন লেখক। বইটির আর একটি বড় পাওনা, লেখকপত্নীর একটি কবিতা, যেখানে ঘোষিত হয়েছে এ সমাজে নারীর স্থান। সময়কে ছুঁয়ে থাকা হৃদয়গ্রাহী এমন একটা বইয়ের এ মুহূর্তে বিশেষ প্রয়োজন ছিল। পাঠকের চেতনায় 'দামিনী' দাগ কাটবেই, এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৩
কলকাতা

দামিনী-ঝলক

শুরুতেই মনে এল রবীন্দ্রনাথের 'দিশি দিশি সচকিত, দামিনী চমকিত'। সারা ভারতবর্ষের আকাশে দামিনী এক আকস্মিক বিদ্যুৎরেখা। রাতের অন্ধকারেই তো দেখা যায় বিদ্যুৎ। সারা দেশের আকাশে যে অন্ধকার নেমে এসেছে, তার মধ্যে এক নির্ভয় হিরন্ময়ীর জীবনযুদ্ধ যেন আঁধারের বুকচেরা বিদ্যুৎ—সার্থক তার দামিনী নাম। সেই বিদ্যুতের ঝলক, তার মহাজাগতিক শক্তি, তার তেজ, তার অপার্থিব জ্যোতির কাছে যেন সারা দেশ হতে পারে নতজানু—আমরা যেন যোগ্য হতে পারি এই কনককন্যার আত্মত্যাগের। দামিনী-ঝলক যেন এই সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করে—নারীর স্নেহ, নারীর মমতা, নারীর যত্ন, নারীর প্রেম আর নারীর মাঙ্গলিক কামনাই আমাদের প্রেরণার উৎস।

নারীর কাছে আমাদের ঋণ কোনওদিন শোধ হওয়ার নয়। নারীকে যেন আমরা শ্রদ্ধা করতে, ভালোবাসতে, তার কাছে নতজানু হতে শিখি। গৃহকোণের সব নারীর মধ্যেই আছে আকাশের দামিনী-ঝলক। যেন ভুলে না যাই।

১ ফেব্রুয়ারি ২০১৩
কলকাতা

সত্যসাধন চক্রবর্তী

এক

মা এসেছিল সেদিন হসপিটালে। ষোলো তারিখ ওই রাতের ঘটনার পর গত দুদিন মা-কে দেখতে পাইনি একবারও...বড্ড দেখতে ইচ্ছে করছিল...আমার সেদিন দ্বিতীয়বার অপারেশন হবে। সারা শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা...চোখের পাতা ভারী হয়ে আসছে বার বার...অপারেশন থিয়েটারে ঢোকার আগে দূর থেকে মাকে দেখতে পেয়েছিলাম...মা দাঁড়িয়েছিল...বড্ড বাঁচতে ইচ্ছে করছিল আবার। জানি,—হয়ত আমি আর থাকব না...তবু—বড্ড লোভ হচ্ছিল আরও একটু বেঁচে থাকতে...আমার ডান হাতটা জুড়ে তখন অসংখ্য ছুঁচ ফুটিয়ে নানারকম চ্যানেল করেছেন ডাক্তাররা...ওই হাতটা অসাড়...তবু,...হাতটা দিয়েই একটিবারের জন্য মায়ের হাতটা ছুঁতে চাইছিলাম...গলার ভেতর থেকে দলা পাকানো

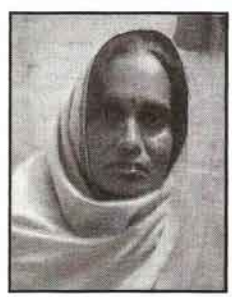

মা

আমার মেয়ে ছিল খুব জেদি আর সাহসী। একবার যদি কোনও কিছু নিয়ে জেদ ধরল, সেটা ও করেই ছাড়ত, কারওর কথা শুনত না। ছোটবেলা থেকেই ওর অসম্ভব জেদ। সেদিন ওর বাড়ি

ফিরতে অত রাত হওয়ার কথা ছিল না। বাড়ি থেকে বেরোবার সময় বলে গেছিল তাড়াতাড়ি ফিরবে। অভেন্দ্র-র সঙ্গে কী একটা কাজে বেরিয়েছিল। সবসময় কাজ আর পড়াশুনো নিয়ে থাকতে ভালোবাসত। কী করে দুটো বাড়তি পয়সা রোজগার করা যায়, যাতে সংসারের সাশ্রয় হয়—সেই চেষ্টাই করত। কাজ তাড়াতাড়ি হয়ে যাওয়ায় হয়তো সিনেমা দেখার প্ল্যান করেছিল। অত রাত হচ্ছে দেখে আমি চিন্তা করছিলাম। ফোন করেছিলাম ওর

শব্দগুলো অস্ফুটে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছিল আমার বিবর্ণ সাদা-শুকনো ঠোঁট বেয়ে...প্রাণপণ শক্তিতে বলতে চাইছিলাম, মাগো! আমি বাঁচতে চাই...আবার আমি ফিরে যেতে চাই তোমার কাছে...আমাদের সেই ছোট্ট ঘরটায়...কত কথা বলতে চাইছিলাম...কত কথা জমে ছিল বুকে...কিছুই বলা হল না...অসহ্য ব্যথায় জিভ অসাড়...মাথাটা অবশ... কেমন একটা অদ্ভুত আচ্ছন্নতায় আবার যেন তলিয়ে যাচ্ছিলাম আমি...আবার...

আবছাচোখে দেখছিলাম মায়ের দু-চোখ ভরা জল...আমিও কাঁদতে চাইছিলাম আপ্রাণ...কিন্তু কাঁদার সামর্থ্যটুকুও যেন নেই আমার...চেতন-অচেতনের মাঝখানে কোথায় যেন তলিয়ে যাচ্ছিলাম আমি...এত ঘুম আসছে কেন দুচোখ জুড়ে...? ...মাকে এত ঝাপসা লাগছে কেন...? ...কেন এত দূরে সরে যাচ্ছে মা...? ...তুমি আমার কাছে থাকো মা...আমার হাতটা ধরো...আমি যে বাঁচতে চাই মা...বাঁচতে চাই...

"মা, ম্যায় জিনা চাহতি হুঁ..."

বলেছিল মৃত্যুপথযাত্রী মেয়েটি। সারা পৃথিবীর উদ্দেশে এই ছিল তার শেষ আকুতি।

সত্যিই বাঁচতে চেয়েছিল সে। জীবনকে ভালোবেসে বাঁচতে চেয়েছিল। রূপ-রস-গন্ধ-বর্ণের এই সুন্দর পৃথিবীতে

থাকতে চেয়েছিল আরও অনেক দিন।

সেই মেয়ে সবে কৈশোর পেরিয়ে পৌঁছে ছিল যৌবনে। কত স্বপ্ন তার। কেমন হবে ভবিষ্যৎ জীবন...কত কল্পনা। জীবনযুদ্ধ শুরু হয়েছিল তার ছোটবেলা থেকে। সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকার দুর্মর সাহস ছিল তার চরিত্রের অভিজ্ঞান।

জীবনের পাঠশালা থেকে পাঠ নেওয়া সেই মেয়ে, যার জীবনের লক্ষ্য ছিল অসংখ্য মানুষের দরবারে মাথা উঁচু করে সসম্মানে নিজের জায়গা প্রতিষ্ঠিত করার—একটু একটু করে অভীষ্টে এগিয়ে যাচ্ছিল সেই সাহসিনী। দারিদ্র্যের আঘাতে নুয়ে পড়া একটা পরিবারকে দেখাতে চেয়েছিল সংকটমোচনের উজ্জ্বল আলো, দিতে চেয়েছিল শাপমুক্তির অনাস্বাদিত স্বাদ। বাবা-মায়ের প্রাণপাত করা লালিত স্বপ্নকে সত্যি করার ব্রত নিয়েছিল সে, চেয়েছিল প্রিয় মানুষগুলোর অধরা সাধকে সাধ্যের মধ্যে নিয়ে আসতে—এই ছিল তার প্রতিমুহূর্তের সাধনা।

অধিকাংশ মধ্যবিত্ত শিশুর মতো মসৃণ ছিল না তার শৈশব। রোজ ভালোভাবে খেতে পেত না সে। ভুগত অপুষ্টিতে। খিদে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ত রাতের পর রাত। দিনের শেষে, ঘরে ঘরে সাঁঝবাতি জ্বলে উঠলে সামান্য পারিশ্রমিকের দৈনন্দিন কাজ সেরে ঘরে ফিরতেন তার বাবা। মেয়েটি দেখত, সারাদিনের কর্মক্লান্ত বিষণ্ণ বাবার কপালে জমে ওঠা ঘাম। তাঁর করুণ হাসিমাখা বেদনাক্লিষ্ট

মোবাইল-এ। ও তখন সবে বাসটা পেয়েছে, বাসে উঠে বসে আমাকে ঘুরিয়ে ফোন করবে বলে, ফোনটা কেটে দিয়েছিল। একটু পরে আমি আবার ওর মোবাইলে ফোন করেছিলাম, কিন্তু পেলাম না। পরে জেনেছি, ওই লুঠেরার দল ওর হাত থেকে মোবাইল কেড়ে নিয়ে রাস্তায় ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল।

যে অত্যাচার ওর ওপর করেছে ওই পশুর দল, সে অত্যাচার যেন আর কোনও মেয়ের ওপর কোনোদিন না হয়। আর কোনও মায়ের বুক থেকে যেন

কোনও মেয়ে এইভাবে হারিয়ে না যায়। আমার কোল খালি করে দিল ওই শয়তানের দল, ওদের যেন শাস্তি হয়। মানুষের বিচারে যা শাস্তি হবে, তা ওরা পাবে। কিন্তু ভগবানের বিচারে ওদের যেন সবচেয়ে বড় শাস্তি হয়। ওই শয়তানের দল যেন পৃথিবীর বুক থেকে

মুখ। লণ্ঠনের আলোয় বাবার অসহায় মুখের দিকে চেয়ে মেয়েটি ভাবত, লেখাপড়া শিখে বড় তাকে হতেই হবে। গরীবের একমাত্র হাতিয়ার যে পড়াশোনা। মেয়েটি বুঝত, মা তার কাছে নিজেদের অভাবের কথা, অসহায়তার কথা লুকিয়ে রাখে। কথার ছলে ভোলাতে চেষ্টা করে তাকে। মেয়েটি বোঝে, মায়ের সেই মিথ্যার পিছনে লুকিয়ে আছে কত চোখের জল, কত অসহায় বেদনা।

মায়ের সেই দুঃসহ যন্ত্রণা ছোট্ট বুকের মাঝে লালন করতে করতেই মেয়েটি নিজের কর্তব্য স্থির করে নিল। জীবনে সফল হওয়ার জন্য নিজেকে তৈরি করবার সংকল্প নিয়েছিল সে, পরিবারের মুখে হাসি ফোটানোর কর্তব্য স্থির

সেই বাসটা যার মধ্যে ভয়ংকর পৈশাচিক ঘটনাটি ঘটেছিল

করে নিয়েছিল। কেবলমাত্র কয়েকটি বছরের প্রতীক্ষা।

নিজের অবিচল লক্ষ্যে এগিয়ে চলছিল সাহসী মেয়ে। বুকের পাঁজরে, শিরায়-ধমনীতে হাতুড়ির শব্দ শুনতে শুনতে বেড়ে উঠছিল সে। আর ঋজু-দৃঢ় হয়ে উঠছিল তার মেরুদণ্ড। শিরদাঁড়াটাকে শক্ত করে ধরে রাখতে চাই দুর্জয় সাহস আর দৃঢ় অঙ্গীকার। হ্যাঁ, পুরোটাই ছিল তার মধ্যে।

কিন্তু বিধাতার বুঝি সইল না। জীবনের ছন্দ কেটে গেল এক লহমায়। আর তাই মাত্র তেইশটা বসন্ত পার করে অকালে-অসময়ে থেমে গেল সেই স্বপ্নের নৌকো। স্বপ্ন আর স্বপ্নপূরণের মাঝখানে নেমে এল আকস্মিক পরদা। পুরুষের আদিম লালসার কাছে পরাজিত হল সুন্দর।

ভারতের জনজীবনে কলঙ্কময় সেই অভিশপ্ত রাত ছিল ১৬ ডিসেম্বর, ২০১২। সাড়ে ন'টা বেজে গেছে। তীব্র শীত কুয়াশার চাদর বিছিয়ে রাজত্ব করছে রাজধানীর বুকে। আকাশে ক্ষয়িষ্ণু চাঁদের লজ্জিত প্রভা। মুনিরকা থেকে দ্বারকায় যাওয়ার রাস্তা প্রায় জনশূন্য। হুসহুস শব্দে একটার পর একটা অটো বেরিয়ে যাচ্ছে তীব্র গতিতে। দক্ষিণ দিল্লির সাকেত মল থেকে ফুটফুটে যৌবনোচ্ছল মেয়েটা বেরোল বন্ধু অভেন্দ্রর সঙ্গে সিনেমা দেখে। জনহীন রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিল বাসস্ট্যান্ডে। হাত দেখালেও থামছিল না কোনও অটো। রাত গড়িয়ে চলেছে। বাড়ি ফিরতে হবে। টেনশন বাড়ছে দুজনেরই। দিল্লির রাত নিরাপদ নয়...

ঘড়িতে তখন প্রায় পৌনে দশটা! রঙিন কাচমোড়া চার্টার্ড বাস তাদের সামনে এসে থেমে গেল। বাসটার গায়ে বড় হরফে লেখা ছিল 'যাদব'। বাস থেকে একজন মুখ

সম্পূর্ণ মুছে যায়। ওদের মতন শয়তান যেন আর কোনোদিন না জন্মায়। এখনও মনে হয়,— আমার মেয়ে যেন আমাকে ছেড়ে কোথাও যায়নি,...ও আছে... এখানেই আছে...আমার কাছেই আছে। এখনই বিছানায় এসে বসে আমার গলা জড়িয়ে ধরবে, বায়না করবে আমার কাছে, যেমন ও করত।

আমি বিশ্বাস করি না, আমার মেয়ে নেই আমার মেয়ে হারিয়ে গেছে চিরকালের মতো।

বাড়িয়ে জানাল, বাসটা দ্বারকার দিকে যাবে। ওরা যেন স্বর্গ হাতে পেল। পড়িমড়ি করে বাসে উঠে পড়ল। বাসে উঠে দেখল, তারা ছাড়া আর ছ'জন 'যাত্রী' রয়েছে। মনে মনে ভাবল, যাক বাবা, নিশ্চিন্ত।

কিন্তু সত্যিই কি নিশ্চিন্ত হতে পারল তারা? হায়! দুজনে কি জানত, তাদের জন্য কী অপেক্ষা করছে বাসের মধ্যে!

ওঠার দশ মিনিটের মধ্যেই যাত্রীহীন ফাঁকা বাসে ওই অচেনা লোকগুলো মেয়েটিকে নানাভাবে উত্যক্ত করতে শুরু করল। তারা প্রত্যেকেই মাতাল ও অপ্রকৃতিস্থ। মেয়েটির বন্ধু, ২৮ বছরের তরুণ, পেশায় সফ্‌টওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, প্রতিবাদ করার চেষ্টা করল। সেই মাতালের দল লোহার রড বের করে বেধড়ক পেটাল তাকে। তারপর মেয়েটিকে টেনে নিয়ে গেল বাসের কেবিনের দিকে।

সেখানেই ড্রাইভার, হেল্পার সহ ছ'জন একের পর এক ধর্ষণ করল তাকে। রাতের বুক চিরে তখনও কিন্তু ছুটে চলেছে সেই কলঙ্কিত হোয়াইট লাইনার চার্টার্ড বাসটি। একবারের জন্যেও থামেনি তার গতি।

সেই মুহূর্তে চরম যন্ত্রণা-বিদ্ধ অবস্থাতেও মেয়েটি কিন্তু ভয় পায়নি একবারের জন্য। মেনে নেয়নি, হেরে যায়নি সে। আর তাই ধর্ষিত-অত্যাচারিত হতে-হতেও তার অন্তিম শক্তিটুকু জড়ো করে প্রতিরোধের চেষ্টা করে গেছে। কিন্তু তার আর্ত চিৎকার বাসের দেওয়ালেই ধাক্কা খেয়ে মরেছে। কেউ তা শুনতে পায়নি।

সেই আর্ত চিৎকার, 'আমাকে বাঁচতে দাও—আমি

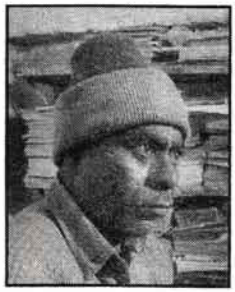

বাবা

এখনও বিশ্বাস করতে পারি না আমার মেয়ে নেই। এখনও মনে হয় ও যেন দোতলায় ওর ঘরে বসে পড়া করছে। একটু পরেই নেমে আসবে চা খেতে। সারা বাড়িতে ওর স্মৃতি ছড়িয়ে রয়েছে। সব আছে, শুধু ও-ই নেই। ওর ঘরটায় ঢুকলে এখনও ওর গায়ের গন্ধ পাই।

সেদিন শেষবারের মতো

বাঁচতে চাই!...'

প্রায় চল্লিশ মিনিট ধরে তার ওপর অকথ্য নির্যাতনের পরেও বর্বরেরা থামল না। অত্যাচারে তাকে মৃতপ্রায় করে দিল। তার এবং তার প্রায়-অচৈতন্য বন্ধুর পোশাক খুলে অর্ধনগ্ন করে দুষ্কৃতিরা চলন্ত বাস থেকে ছুড়ে ফেলে দিল মহীপালপুর সেতুর ওপর থেকে প্রায় ১৫-১৬ ফুট নীচে ঝোপজঙ্গলের মধ্যে। স্বাধীন ভারতের ইতিহাসের পাতায় লেখা হল এক নির্লজ্জ রাতের কালো অধ্যায়।

বাড়ি থেকে বেরোবার সময় আয়নার সামনে ওর চিরুনিটি যেমন ভাবে ও রেখে গেছিল, তেমন করেই এখনও পড়ে আছে ওটা। চিরুনির ফাঁকে আমার মেয়ের মাথার কয়েকটা

অভিশপ্ত বাসের ভিতরটি

চুল আটকে রয়েছে
আজ-ও। ওর সঙ্গে
শেষবারের মতো কথা
বলেছিলাম ২৪ ডিসেম্বর,
বড়দিনের আগের রাতে।
তখন আবার ওর কথা
বন্ধ হয়ে গেছিল।
আমাকে মেয়ের কাছে
যেতে দিচ্ছিল না
হাসপাতালের
ডাক্তারবাবুরা। ও
হাসপাতালে ভর্তি হবার
পর থেকে একদিনের
জন্যেও আমি বাড়ি
ফিরিনি। দিনরাত

দুই

আবার যেন একটু একটু করে আমার ভেতরে জেগে উঠছিলাম আমি। মনে হচ্ছিল যেন অনেকটা পথ হেঁটে এসে বড় ক্লান্ত আমি। বাইরে কত কী ঘটে যাচ্ছিল আমাকে নিয়ে, কিন্তু ভেন্টিলেশনের শীতল নিস্তব্ধতায় আমার কোনো দিন রাত্রির হিসেব নেই...শুধু জানি, এখনও আমি হেরে যাইনি...এখনও আমি নতজানু হইনি মৃত্যুর কাছে...স্বপ্নের মধ্যে অনেক দূর থেকে যেন কাদের অস্পষ্ট কলরব শুনতে পাচ্ছিলাম...যেন কোন হারিয়ে যাওয়া অতীত থেকে কথা বলছিলো ওরা...যেন খুব কাছে অথচ যোজন দূর থেকে ভেসে আসছে তাদের গলার আওয়াজ...! কারা ওরা...? ওই তো, ওদের দেখতে পাচ্ছি...ওই তো সন্টু, ওই যে চান্নি, ওই তো প্রীতি, আর ওই যে দূরে এককোণে দাঁড়িয়ে, ছিচ্‌কাদুনে মেয়েটা,...ও মুন্নি...ওরা সব

আমার ছেলেবেলার খেলার সাথী...ওদের সঙ্গে কত খেলতাম আমি...চোর পুলিশ...এক্কাদোক্কা.....

একটু পিছন ফিরে দেখা যাক।

উত্তরপ্রদেশের বালিয়ার মান্ডওয়াড়া কালান গ্রামে কুয়াশাভেজা ভোর। অন্ধকার সরিয়ে সবেমাত্র সূর্য পূব আকাশের গায়ে আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে। গ্রামের রুক্ষ জমির উঁচু আলপথ দিয়ে বাবার হাত ধরে ছোট্ট ছোট্ট পায়ে হেঁটে যাচ্ছে মিষ্টি একটা মেয়ে।

একটা নির্ভীক জীবনের কথামালা এখান থেকেই শুরু হয়েছিল। মেয়েটি চলেছে বেশ কয়েক কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে গ্রামের ইস্কুলে। দুচোখে তার অনেক স্বপ্ন। সেই বয়সেই সে বুঝেছিল, বড় হতে হবে তাকে, লেখাপড়া শিখতে হবে। বাবার হাত ধরে পরম নিশ্চিন্তে সে পথ চলেছে। বাবার মনেও অনেক আশা। দারিদ্র্যের সঙ্গে সহবাস তাদের। সামান্য রোজগার, কিছু পৈতৃক জমির চাষ-আবাদ থেকে। আর দিল্লি এয়ারপোর্টে বেসরকারি বিমান সংস্থায় সামান্য মালবাহকের কাজ। এই মেয়েকে ঘিরে তাঁর অনেক ইচ্ছে। মেয়ে লেখাপড়া শিখবে—বড় হবে—সংসারের দায় মাথায় তুলে নেবে। লেখাপড়ায় বড় মনোযোগ মেয়ের। স্কুলের পরীক্ষায় বরাবর ভালো ফল করে। বাবার মনে ইচ্ছেরা দানা বাঁধে। সব শক্তি দিয়ে,

হাসপাতালেই পড়ে থাকতাম মেয়ের কাছে। সেদিন রাতে যখন ওর কাছে গেলাম আমি, আমায় দেখে ইশারায় জিগ্যেস করল, আমার রাতের খাওয়া হয়েছে কিনা। আমি বললাম, হ্যাঁ খেয়েছি। তখন ও আবার আমায় ইশারায় বলল, 'তাহলে এবার শুয়ে পড়ো। একটু রেস্ট নাও।' সব দিকে নজর ছিল আমার মেয়ের। সবাই যাতে ভালো থাকে, সংসারের যাতে ভালো হয়—সে দিকে সবসময় নজর ছিল ওর। শরীরে তখন অত যন্ত্রণা-অত কষ্ট, তার মধ্যেও ওর মাথা সজাগ রয়েছে, তার

মধ্যেও ও খেয়াল রাখছে আমার শরীরের। আমি ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললাম, 'শোব মা, ঠিক সময়ে শোব। তুমি চিন্তা কোরো না—তুমি ঘুমোও।' সেই আমার শেষ কথা ওর সঙ্গে। আর কথা হয়নি। আর কোনোদিন হবেও না

প্রয়োজনে শেষ সংস্থানটুকু দিয়েও মেয়েকে পড়াবেন তিনি। নিজের লেখাপড়া বেশিদূর এগোয়নি, কিন্তু মেয়েকে শিক্ষিত করে তুলবেনই—দশজনের একজন হবে মেয়ে। আর তাঁর বুক গর্বে ভরে উঠবে! আর কী চাই! মেয়ের ছোট্ট মুঠি আরও জোরে আঁকড়ে ধরে গ্রামের আলপথ ধরে চলেন বদ্রি সিং পান্ডে।

ছেলেবেলায় বন্ধুদের সঙ্গে এক্কাদোক্কা-চোরপুলিশ খেলার ফাঁকে একটা অদ্ভুত খেলা খেলত এই মেয়ে। ডাক্তার ডাক্তার খেলা। গলার দুপাশ দিয়ে চুলে বাঁধবার ফিতে ঝুলিয়ে স্টেথোস্কোপ বানিয়ে ডাক্তার সাজত সে।

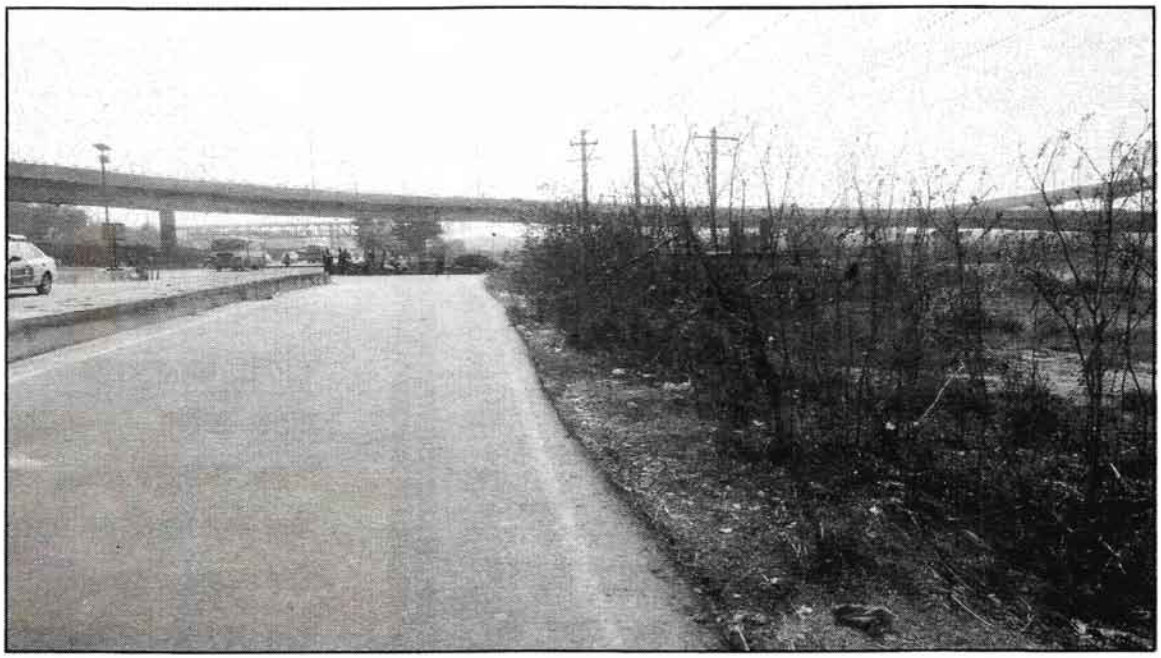

ব্রিজের ওপর থেকে যেখানে ফেলেছিল দামিনীকে

তার বন্ধুদের সব রোগী বানিয়ে দিত, তারা সব শুয়ে পড়ত পথের ধুলোয়—যেন হাসপাতালের সারি সারি কাল্পনিক বেড। আর সেই মেয়ে ডাক্তারি করত তাদের ওপর। ছোট্টবেলা থেকেই তার ডাক্তার হবার স্বপ্ন ছিল। বাঁচার সঠিক ছন্দটাকে খুঁজে পেতে চাইত অবিরাম, তার ছোট্ট হৃদয় ভরে কল্পনার রঙিন উড়ানে মানুষের সেবা করার, মানুষকে বাঁচাবার স্বপ্ন দেখত।

বাবারও খুব ইচ্ছে ছিল, মেয়ে বড় হয়ে লেখাপড়া শিখে নামকরা ডাক্তার হোক। মা চাইতেন, বড় হয়ে মেয়ে এই হতদরিদ্র সংসারটার হাল ধরুক। আর দাদু চাইতেন, তাঁর ছোট্ট নাতনি বড় হয়ে এমন কিছু করুক, যাতে দেশের দশের সকলের মুখে মুখে তার নাম ফেরে!

দুরন্তপনাতেও কম যেত না সে! তার দস্যিপনা আর ডানপিটে স্বভাবের জন্য বন্ধুরা তাকে বেশ সমীহই করত। আর ছিল দুর্দান্ত সাহস। ছোটবেলা থেকেই ভয় পেতে সে শেখেনি। অদম্য প্রাণশক্তি আর অনমনীয় সাহসের হাত ধরে সে-মেয়ে চিরদিন নির্ভয়া।

বাবা-মা-সে আর তার পরে ছোট দুই ভাই—গৌরব আর সৌরভ, এই নিয়ে তাদের পরিবার। উত্তরপ্রদেশের শেষ সীমানায়, বিহার সীমান্তবর্তী বালিয়া জেলার অখ্যাত মাগুওয়ারা কালান গ্রামে তাদের পৈতৃক ভিটে। বাবার কাজের সূত্রে আর ভাই-বোনেদের পড়াশুনোর কারণে পরবর্তী সময়ে দিল্লিতেই তারা দ্বারকা রোডের মহাবীর

কথা। অনেক দূরে চলে গেল আমাদের সবাইকে ছেড়ে।
আমাদের পরিবারকে ওই ধরে রেখেছিল সব দিক দিয়ে। ও চলে গেল, কী ক'রে সব চালাবো জানি না। আগামী দিনগুলো সব অন্ধকার। আমাদের অনেক বড় ক্ষতি হয়ে গেল। এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না ও নেই। যারা ওর এত বড় সর্বনাশ করল, তাদের আর যেই ক্ষমা করুক, ভগবান যেন কোনোদিন ক্ষমা না করে।

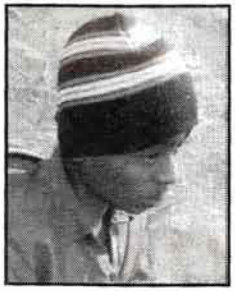

ভাই গৌরব

আমার দিদি আমার আদর্শ। আমি বড় হয়ে উঠেছি আমার দিদিকে সামনে রেখে। সব সময় মনে রেখেছিলাম, আমাকে সবদিক থেকে দিদির মতন হয়ে উঠতে হবে। দিদি নেই, এখন আর কাকে সামনে রেখে বড় হব জানি না। আমার

এনক্লেভ অঞ্চলে দরিদ্র বস্তি এলাকায় একটা মাথা গোঁজার মতো ঠাঁই-এর ব্যবস্থা করে। ছোটখাটো আধভাঙা ইঁট বের করা সবুজ রং-এর টিনের দরজা দেওয়া একটা বাড়ি। গায়ে গায়ে ঘেঁষাঘেঁষি পড়শিদের বাস। অলি-গলি তস্য গলির নোংরা-আবর্জনায় ভরা অস্বাস্থ্যকর এক চিলতে আকাশ দেখা যাওয়া বাড়িতে তাদের দিন রাত্রি কেটে যায়। দ্বারকা রোডের মহাবীর এনক্লেভের ফেজ-২ এর ২৭ নম্বর গলির একদম শেষ মাথায় তাদের বাড়ি।

রাস্তা থেকে অনেকটা নীচুতে তাদের বাস। দরজা দিয়ে ঢুকে কয়েক ধাপ সিঁড়ি দিয়ে নেমে বাঁ হাতে পাশাপাশি দুটো ঘুপচি ঘর। ডান হাতে একচিলতে একটা রান্না ঘর। দুই ঘরে দুটো মলিন বিছানা, ইঁট বের করা সাদা চুনলেপা দেওয়াল। কম পাওয়ারের নিবু-নিবু সাদা লাইট ঝুলছে দুই ঘরে। কয়েকটা ভাঙা টিনের আর প্লাস্টিকের চেয়ার।

একটা ঘরে একটা আয়না বসানো বড় টিনের আলমারি। আর একটা ঘরে একটা মাঝারি মাপের কাঁচ বসানো কাঠের আলমারি আর একটা কাঠের সিন্দুক। দুই ঘরেই বিছানার ওপর গোটানো কালচে হয়ে যাওয়া মশারি। ঘর থেকে বেরিয়ে কয়েক ধাপ সিঁড়ি উঠে একচিলতে ছাদ। ছাদের একপাশে ছোট একটা ঘর। ঘরে একটা তক্তপোশ, তার ওপরে মলিন চাদর পাতা। এঘরেও দেওয়াল থেকে ইলেকট্রিক তারে ঝুলছে কম পাওয়ারের সাদা আলো। বিছানার পাশে দেওয়ালের র‍্যাকে স্তূপ করে রাখা বই-খাতা

পত্র। এটা দামিনীর পড়ার ঘর।

লেখাপড়ায় অসম্ভব মনোযোগ তার। গরিবের উত্তরণের একমাত্র পথ লেখাপড়া, সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার একমাত্র হাতিয়ার শিক্ষা। সেই শিক্ষাই পেয়েছিল দামিনী—তাই প্রাণপণ করে পড়াশুনো চালিয়ে যাচ্ছিল সে। হতদরিদ্র পরিবার। আর্থিক সংগতি নেই। সংস্থানও নেই তার পড়াশুনো সামাল দেবার। তবুও হেরে যায়নি সে। পাশে ছিল তার পরিবার। বন্ধুদের কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে, 'নোট' ধার করে এনে রাত জেগে একমনে পড়ত দামিনী। পড়তে পড়তে কখন যেন দুচোখের পাতা ভারী হয়ে ঘুম

আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না। দিদির সঙ্গে কত খুনসুটি-কত ঝগড়া-মারপিট করতাম। এখন আর সেসব করার কেউ রইল না। দিদি চলে যাওয়ার পর থেকে আমি আর একদিনের জন্যেও বই নিয়ে বসিনি। দিদির কোনো ছবিও দেখিনি

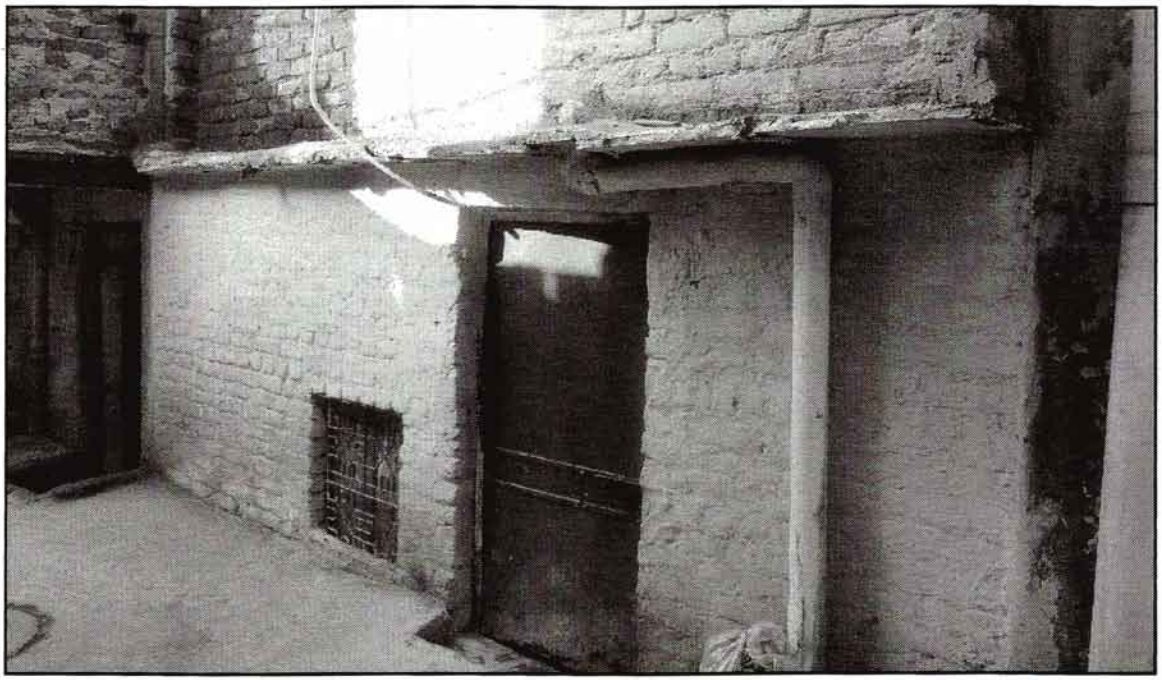

ঘরে ঢোকার মূল দরজা। বাড়ির সামনের ছবি

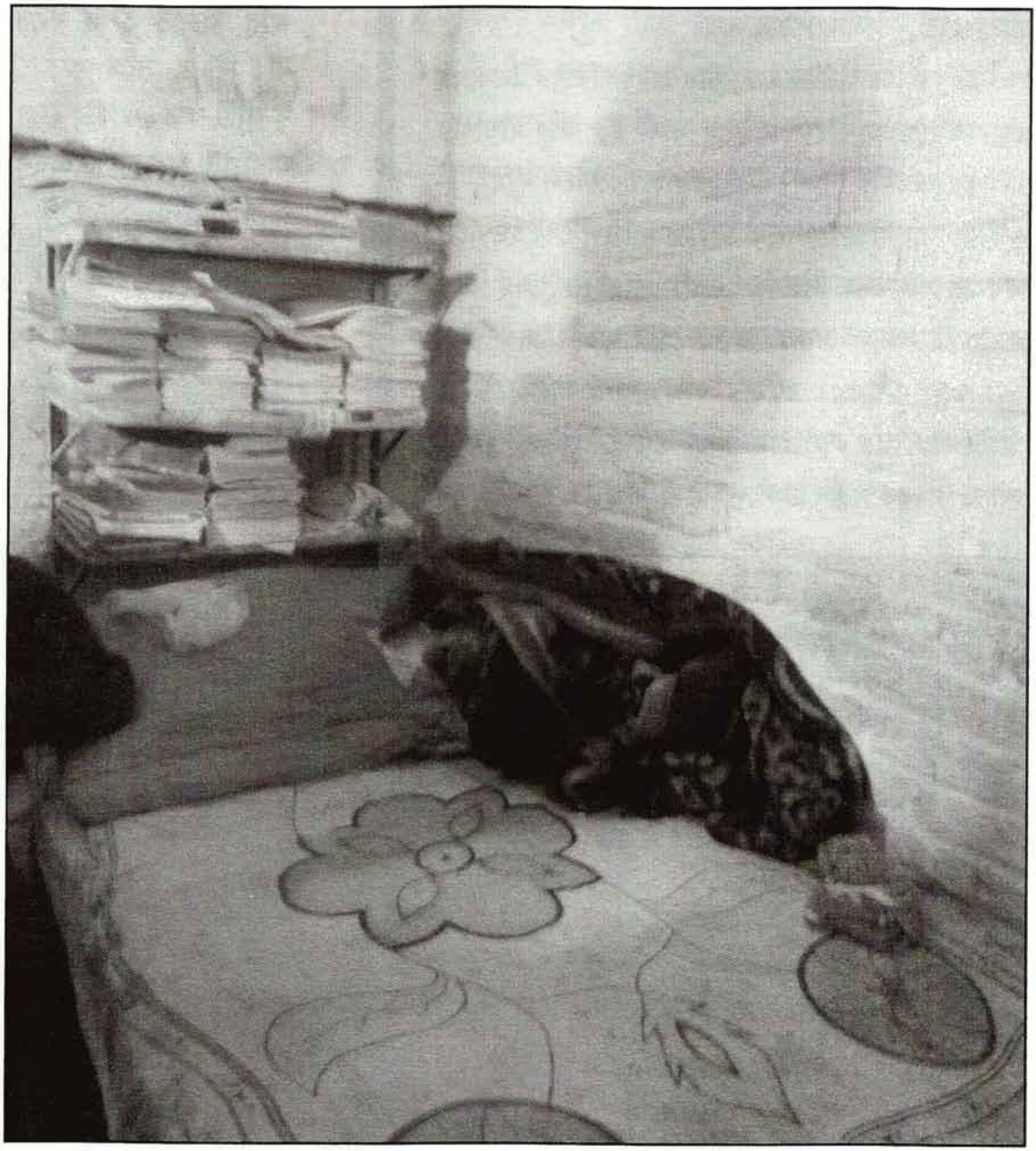

দামিনীর ঘর। নিজের বিছানা, র‍্যাকে পড়ার বই

নেমে আসত। ঢুলতে ঢুলতে তবুও পড়ত।

গভীর রাতের আঁধারে সবাই যখন ঘুমে অচেতন, তখন একমাত্র মা জেগে বসে থাকতেন, তার পাশটিতে। মেয়ে রাত জেগে পড়ছে, মা কি ঘুমোতে পারেন? মেয়ের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন মা। সাহস দিতেন মেয়েকে এগিয়ে চলার জন্যে। ঘুমে ঢলে পড়তে পড়তে ঝটকা দিয়ে

একবারও। দোতলায় ওর পড়ার ঘরটায় সেদিনের পর থেকে আর একবারও যাইনি। রাস্তায় বেরোতে পারি না। সবাই যেন কেমন করে দেখে আমায়।

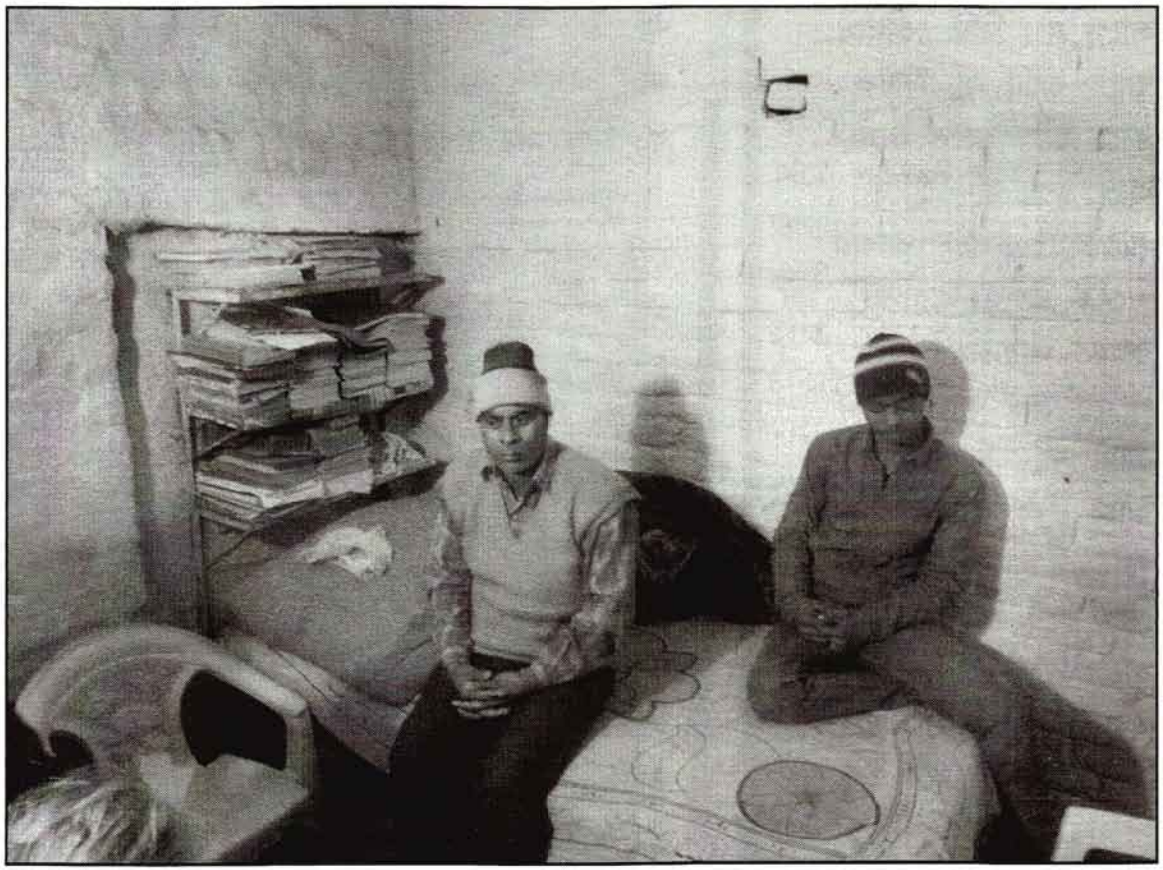

বাবা-ভাইয়ের এখন শুধু স্মৃতিই সম্বল

আমাকে দেখলেই সবাই চুপ করে যায়, নিজেদের মধ্যে কথা বন্ধ করে দেয়। আমার ভালো লাগে না। দিদি কোথায় আছে জানি না, দিদির কাছে চলে যেতে ইচ্ছে করে খুব। যদি যেতে পারতাম, তাহলে আবার অনেক ঝগড়া-মারপিট করতে পারতাম।
পরের জন্ম আছে কিনা জানি না, যদি থাকে, আমি যেন আমার সবজন্মে ওকেই আমার দিদি করে পাই। পড়তে বসলেই মনে হচ্ছে, এক্ষুনি দিদি এসে পাশে বসে দেখিয়ে দেবে অঙ্ক, বিজ্ঞান। এসব বিষয়ে ওর এত আগ্রহ ছিল যে

আবার সোজা হয়ে বসত সেই মেয়ে, জ্বালা ধরা দুটো চোখ মেলে আবার শুরু করত তার লড়াই। তাকে যে বড় হতেই হবে, মাথা উঁচু করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে, তবেই তো এই বিবর্ণ সংসারকে একদিন রঙিন করে তুলতে পারবে! তার তো হেরে গেলে চলবে না, তাকে তো জিততেই হবে! তাকে যে শেষ লড়াইটা লড়তেই হবে!

মা দেখতেন, দুচোখ ভরে দেখতেন, রাত জেগে মেয়ের এই জেদ আর প্রতিজ্ঞা। দুচোখ ভরে উঠত জলে। মনে মনে স্বপ্ন দেখতেন, তাঁর এই মেয়ে একদিন অনেক অনেক বড় হবে...মান রাখবে...মুখ রাখবে তাঁদের পরিবারের।

করজোড়ে গৃহদেবতার পায়ে প্রার্থনা জানাতেন, মেয়ের যেন মঙ্গল হয়। সব বিপদ থেকে যেন সে রক্ষা পায়। সব বাধা যেন টপকে যেতে পারে সে। মনে মনে বিশ্বাস ছিল, তাঁর মেয়ে পারবে একদিন মাথা তুলে দাঁড়াতে, কারণ দুর্জয় সাহস তার বুকে, সব প্রতিকূলতার সঙ্গে সে পাল্লা দিতে জানে। কঠিন তার শ্রমের শক্তি, ভয় কাকে বলে—সে জানে না। সে নির্ভয়। সে সৎ। সে লক্ষ্যে স্থির।

মেয়েটির ঠিক পরের ভাই গৌরব। তার সঙ্গেই ছিল তার যত খুনসুটি, যত বন্ধুত্ব। দিনের শেষে বাড়িতে ফিরলেই দিদির পেছনে লাগত গৌরব। দিদি খেপে যেত। তারপর শুরু হতো দুই ভাই-বোনের ঝগড়া-মারপিট। কপট মান অভিমান। বালিশ নিয়ে একে অন্যকে আক্রমণ করত, বালিশযুদ্ধ চলত—যতক্ষণ না একজন পরাস্ত হচ্ছে।

মেয়েটি টেলিভিশনে 'বিগ-বস' দেখতে খুব ভালোবাসত। একটা এপিসোডও মিস করত না। 'বিগ বস' চলার সময় দিদিকে রাগাবার জন্যে গৌরব মাঝেমাঝে টিভির সামনে আড়াল করে দাঁড়িয়ে যেত। আর দামিনী চিৎকার জুড়ত, "মা, দেখো না ভাইয়া মুছে তঙ কর রহা হ্যায়"। আবার ভাইয়ের পড়াশুনোর খবরও রাখতো

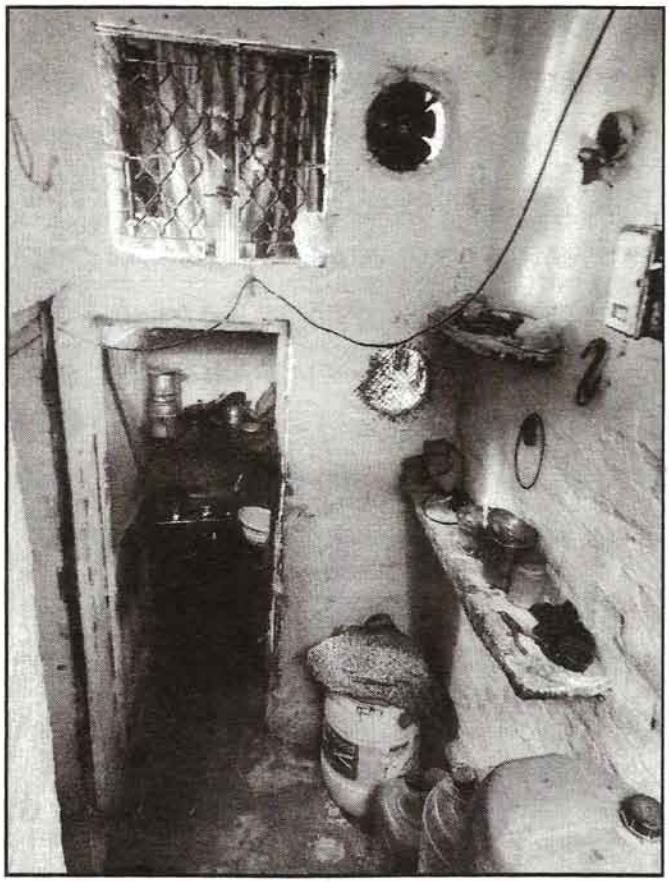

ওদের বাড়ির রান্নাঘর

সবসময় বলত, সায়েন্স নিয়ে পড়তেই হবে। নয়ত ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার কিছুই হতে পারবি না। ওর খুব ইচ্ছে ছিল, আমি ইঞ্জিনিয়ার হব। ও ডাক্তার আর আমি ইঞ্জিনিয়ার, একটা পরিবারের মধ্যে দু'রকমই থাকল।
ও এখন যেখানেই থাকুক, যেন ভালো থাকে। আর ওকে যারা এত বড় শাস্তি দিল, এত কষ্ট দিল,— তাদের যেন কেউ ক্ষমা না করে।

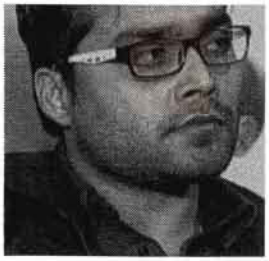

দামিনীর বন্ধু

অভেন্দ্র

যদি ওকে বাঁচাতে পারতাম! এই আক্ষেপ আমার সারাজীবনের সঙ্গী হয়ে থাকবে। প্রায় আধ ঘণ্টা পড়ে ছিলাম রাস্তায়, কেউ এগিয়ে আসেনি সাহায্যে। গভীর রাতে শীতের দিল্লিতে রাস্তায় তত লোক না থাকলেও মাঝেমাঝেই দু-চারজন যাচ্ছিল পাশ দিয়ে। অটো, গাড়ি, বাইকও চলছিল। কেউ কেউ গতি কমালেও শেষ পর্যন্ত দাঁড়ায়নি। কত কাকুতি মিনতি করেছি,কেউ ফিরেও তাকায়নি। একজনের কাছে জ্যাকেট চাইলাম আমার

নিয়মিত। নিজে ভাইদের পড়াত, কোথাও কোনও সমস্যায় পড়লে পড়া দেখিয়ে দিত। প্রচুর টিউশনও করতো। দুটো পয়সা রোজগার করে সংসারের সুরাহার জন্য করত। আবার নিজে যখন সময় পেত না, তখন গৌরবকে দায়িত্ব দিত টিউশনের।

পড়াশুনোয় এতটাই ভালো ছিল যে, যখন সে ক্লাস টেন-এ পড়ত, তখনই ক্লাস নাইনের ছাত্রদের পড়াত। আবার ছোট ছোট ক্লাস থ্রি-ফোর-এর বাচ্চাদেরও পড়াত।

গৌরবের আদর্শ ছিল তার দিদি। তার দিদির মতোই পড়াশুনোয় সে ভালো হবে, পরীক্ষায় ভালো ফল করবে—এই ছিল তার স্বপ্ন। হয়তো দিদির মতো সে মেধাবী নয়, কিন্তু দিদির বকুনি খেয়ে খেয়ে গৌরব পড়াশুনোর পেছনে প্রচুর খাটত। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার স্বপ্ন ছিল গৌরবের। কিন্তু দিদি চলে যাবার পর আর বই নিয়ে বসতে ভালো লাগছে না গৌরবের। কলেজ যেতে পারছে না আর। ২৯শে ডিসেম্বরের পর থেকে আর একবারও বই ছুঁয়ে দেখেনি সে।

বইগুলোর দিকে তাকালেই বুকের ভেতর পুড়ে যাচ্ছে তার...হু-হু করে উঠছে...। এত বড় একটা পৃথিবী, কোথাও তার দিদি নেই! তার দিদি, তার প্রাণের বন্ধু...এই তো কিছুদিন আগেও ছিল, কিন্তু আর নেই...নেই...।

কেন তার দিদি হারিয়ে গেল চিরদিনের মতো? কেন? কেন? কেন?

তিন

পড়াশুনোর প্রাথমিক পর্ব চুকিয়ে একটা একটা করে সিঁড়ি বেয়ে উঠে মেয়েটি অবশেষে দেরাদুনের একটি কলেজে প্যারামেডিক্যাল পড়বার সুযোগ পেল। এতদিনে যেন ভাগ্যদেবতা সদয় হলেন কিছুটা। স্বপ্ন সফল হওয়ার পথ সুগম হল।

ছোটবেলা থেকেই বড় ডাক্তার হবার শখ মেয়েটির। বাবার বুক গর্বে ভরে উঠল। এই তো চেয়েছিলেন তিনি, মেয়ে মানুষ হোক—বড় হোক! তাঁদের পরিবারের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠুক। কিন্তু প্যারামেডিক্যাল পড়ার খরচ তো অনেক! সামান্য আয়ের এক গরিব পরিবারের পক্ষে কীভাবে সম্ভব এই বিপুল খরচ চালানো! সারা পরিবারের

বান্ধবীর লজ্জা নিবারণের জন্য, সে শুনলই না। সংবাদ মাধ্যমে কত কী বেরোচ্ছে ১৬ ডিসেম্বরের পর থেকে, মানুষ নিজেদের সুবিধেমত ব্যাখ্যা করে নিচ্ছেন। আমি সবাইকে জানাতে চাই ঠিক কী ঘটেছিল সেই রাতে, আমি আর আমার বান্ধবী ঠিক কীসের মুখোমুখি হয়েছিলাম। এর থেকে শিক্ষা নিয়ে যদি মানুষ অন্যের জীবন বাঁচাতে এগিয়ে যান, সেই আশায় বলব।

বাসের ভেতর যারা ছিল, তারা রীতিমতো ডেকে ডেকে বাসে তুলল আমাদের। জানালায় কালো কাচ ছিল, পর্দাও লাগানো ছিল। আসলে

ওরা ফাঁদ পেতেছিল। বোধহয় ওরা আগেও অপরাধ করেছে। ওরা আমাদের মারধর করল, লোহার রড দিয়ে মারল, জামাকাপড় ছিঁড়ে দিল, যা কিছু ছিল সব কেড়ে নিল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আগে থেকে ওরা ছক কষে রেখেছিল এমন কিছু করবে। চালক আর হেল্পার ছাড়া বাকিরা প্রথমে এমনভাবে বসে ছিল যেন যাত্রী। আমরা এমনকী ২০ টাকা করে ভাড়াও দিলাম। এরপরই ওরা আমার বান্ধবীকে উত্যক্ত করতে শুরু করল। আমি প্রতিবাদ করতেই কথা কাটাকাটি হল। ওদের তিনজনকে মেরেছিলাম আমি। তারপর ওরা লোহার রড

মুখে দুশ্চিন্তার কালো ছায়া। তাদের মেয়ের এতদিনের সাধনা-শ্রম—তা কি বিফলে যাবে! না, তা কিছুতেই হতে দেওয়া যায় না, কিছু একটা করতেই হবে! কিন্তু কী করা যায়? কিছুতেই ঠিক করা যাচ্ছিল না। রাতের পর রাত নির্ঘুম-দুশ্চিন্তায় কেটে যাচ্ছিল। অথচ সময় একেবারেই হাতে নেই। নির্দিষ্ট দিনের মধ্যেই ভর্তি হতে হবে! একটা একটা করে দিন কেটে যাচ্ছিল, আর দুশ্চিন্তার কালো রেখা গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছিল।

শেষ পর্যন্ত দামিনীর দাদুই বুদ্ধিটা দিলেন। তাঁদের পরিবারের নিজস্ব যে সামান্য জমিটুকু আছে, উত্তর প্রদেশের গ্রামে, সেইটুকুই বেচে দিয়ে নাতনিকে ডাক্তারিতে ভর্তি করা হোক। ওই টাকাতেই ওর পড়াশুনোর খরচ চলবে। পরিবারের অন্য সবাই এ প্রস্তাবে, আশংকায় কেঁপে উঠল। গরীবের শেষ সম্বল ওইটুকু জমি! সেটাও যদি চলে যায়—তাহলে ভবিষ্যতের জন্যে আর কী থাকবে!

দাদু বললেন, 'পরীক্ষায় পাশ করে ডাক্তার হয়ে ওই মেয়েই দায়িত্ব নেবে সবার। ভবিষ্যতের চিন্তা কী! মেয়ে ডাক্তার হলে ওরকম জমি আরও অনেক হবে। ওই মেয়েই তো আসল সম্পদ—আসল আমানত।'

অতএব পরিবারের নিরাপত্তার একমাত্র উৎস সেই

একটুকরো জমি বেচে বাবা-মা মেয়েকে ডাক্তারিতে ভর্তি করলেন। শুরু হল নতুন লড়াই। স্বপ্ন ডানা মেলল আরও বড় আকাশে।

প্যারামেডিকেলে ভর্তি হল মেয়েটি, দেরাদুনের কলেজে। অল্পদিনের মধ্যেই তার হাসি-খুশি মিষ্টি স্বভাবের জন্য সহপাঠীদের মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠল সে। সবাই তাকে ভালোবাসে—সেও ভালোবাসে সবাইকে। সবাই এনে আমাকে পেটাতে লাগল। জ্ঞান হারাতে হারাতেই বুঝলাম, আমার বান্ধবীকে ওরা টেনেহিঁচড়ে সরিয়ে নিচ্ছে ড্রাইভারের কেবিনের দিকে।

দু' থেকে আড়াই ঘণ্টা ঘুরে ছিল বাসটা। আমার জ্ঞান ফিরে আসতেই

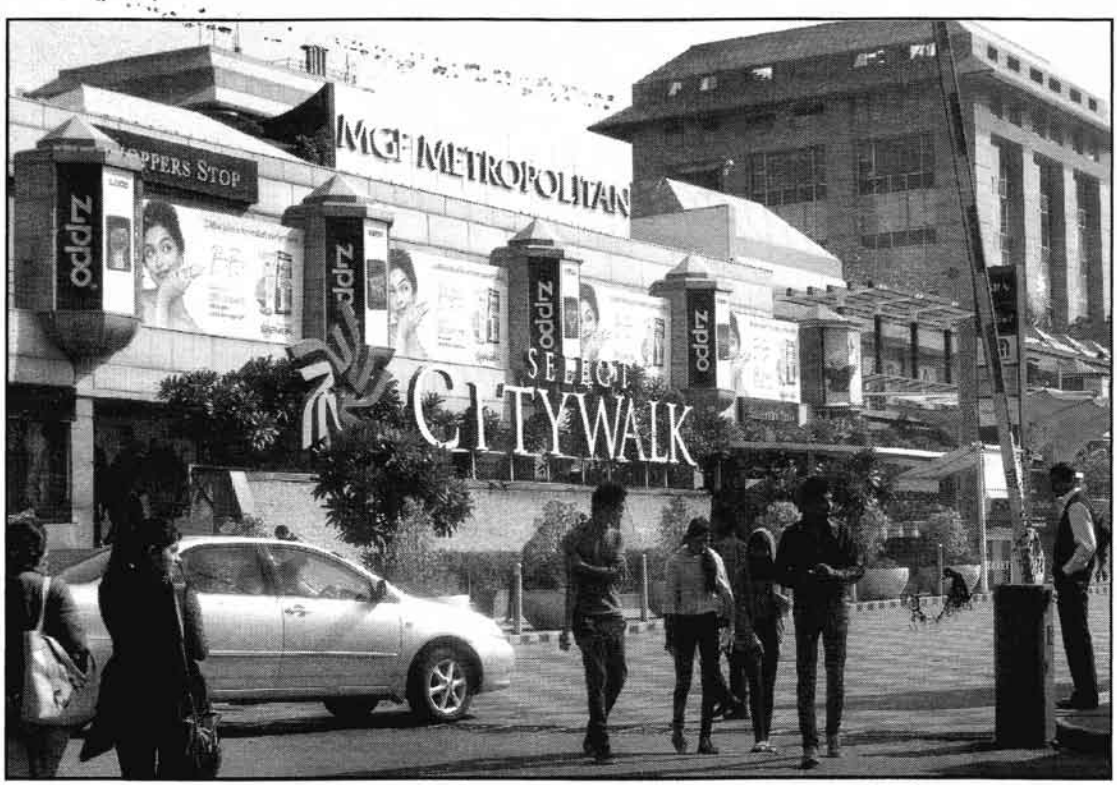

'সাকেত মল' যেখানে দামিনী জীবনে শেষবারের মতো সিনেমা দেখতে গিয়েছিল।

চেঁচিয়ে উঠলাম। আমার বান্ধবীও চিৎকার করছিল প্রাণপণ। যদি বাইরে থেকে কেউ শুনতে পায়, এই আশায়। কিন্তু ওরা বাসের সব আলো নিভিয়ে দিয়েছিল, দুটো দরজাই বন্ধ ছিল। আমরা দুজনেই কিন্তু ওদের সঙ্গে লড়ে যাচ্ছিলাম। আমাকে মারের হাত থেকে বাঁচানোর চেষ্টা পর্যন্ত করেছিল আমার বান্ধবী। পুলিশ কন্ট্রোল রুমের ১০০ নম্বর ডায়াল করার চেষ্টা করল ও, কিন্তু ওরা মোবাইল কেড়ে নিল। একটা নির্জন জায়গায় বাস থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার পর ওরা আমাদের পিষে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। আমি কোনওমতে টেনে সরিয়ে

দেখে মুগ্ধ। অদ্ভুত সাহসী একটা মেয়ে, কোনও কিছুকেই ভয় পায় না। তার বন্ধুরা যখন কোনও সমস্যায় বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে, ইতস্তত করে, সংকোচ করে, সে তখন এগিয়ে যায় মাথা উঁচু করে, নিঃসংশয়ে। দুর্জয় সাহস তার। তাকে তো এর যোগ্য প্রতিদান দিতেই হবে। মলিন সংসারটাকে টেনে বার করতেই হবে দারিদ্র্যের নাগপাশ থেকে! এই প্রতিজ্ঞা তার মনোবল বাড়িয়ে তোলে—তাকে আরও বেশি মনোযোগী করে তার ঈপ্সিত লক্ষ্যে।

প্যারামেডিকেলের সিলেবাসের চাপ নিতে নিতে যখন সে ক্লান্ত হয়ে পড়ত, তখন জীবনের রসদ খুঁজতে চেয়ে একটু শ্বাস নিতে চাইত হয়তো বুক ভরে। একটু মজা, একটু আড্ডা, বন্ধুদের সঙ্গে আনন্দের স্রোতে হারিয়ে যাওয়া, তাকে নতুন করে প্রাণপ্রাচুর্যে ভরিয়ে দিত। নতুন এনার্জি, নতুন উদ্যম, নতুন এগিয়ে যাওয়ার শক্তি আরও কঠোর শ্রমে প্রাণিত করত তাকে।

দিল্লির অভেন্দ্র পান্ডে-র সঙ্গে তার একটা নিখাদ-সুন্দর বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। ২৮ বছরের তরুণ, পেশায় সফ্‌টওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, একটি বেসরকারি সংস্থায় চাকরি করে। সুন্দর

একটা সখ্য ছিল দামিনীর সঙ্গে অভেন্দ্রর। কর্মক্লান্ত দিনের শেষে নাগরিক সন্ধ্যায় মাঝে মাঝেই দেখা হত তাদের। একটুকরো অবসরে অনেক হাসি-গল্প-কথা হত। দুজনে নিছক মামুলি আড্ডায় মেতে সারাদিনের কাজের ক্লান্তি আর পাহাড় প্রমাণ টেনশনের বোঝা হালকা করত। আড্ডার সঙ্গে সঙ্গে এসে পড়ত তর্ক-বিতর্ক। তর্ক গড়িয়ে যেত ঝগড়াতেও। কিছুক্ষণের জন্য কথা বন্ধ। কিন্তু একটু পরেই আবার হাসি, আবার আড্ডা, আবার তর্ক।

নিই আমার বান্ধবীকে। শীতের রাতে আধঘণ্টা প্রায় নগ্ন অবস্থায় পড়ে রইলাম। শেষমেষ একটা টহলদারী ভ্যান এসে দাঁড়াল, তারাই খবর দিল পুলিশে। প্রায় ৪৫ মিনিট পর তিনটি পি সি আর ভ্যান এল বটে, কিন্তু

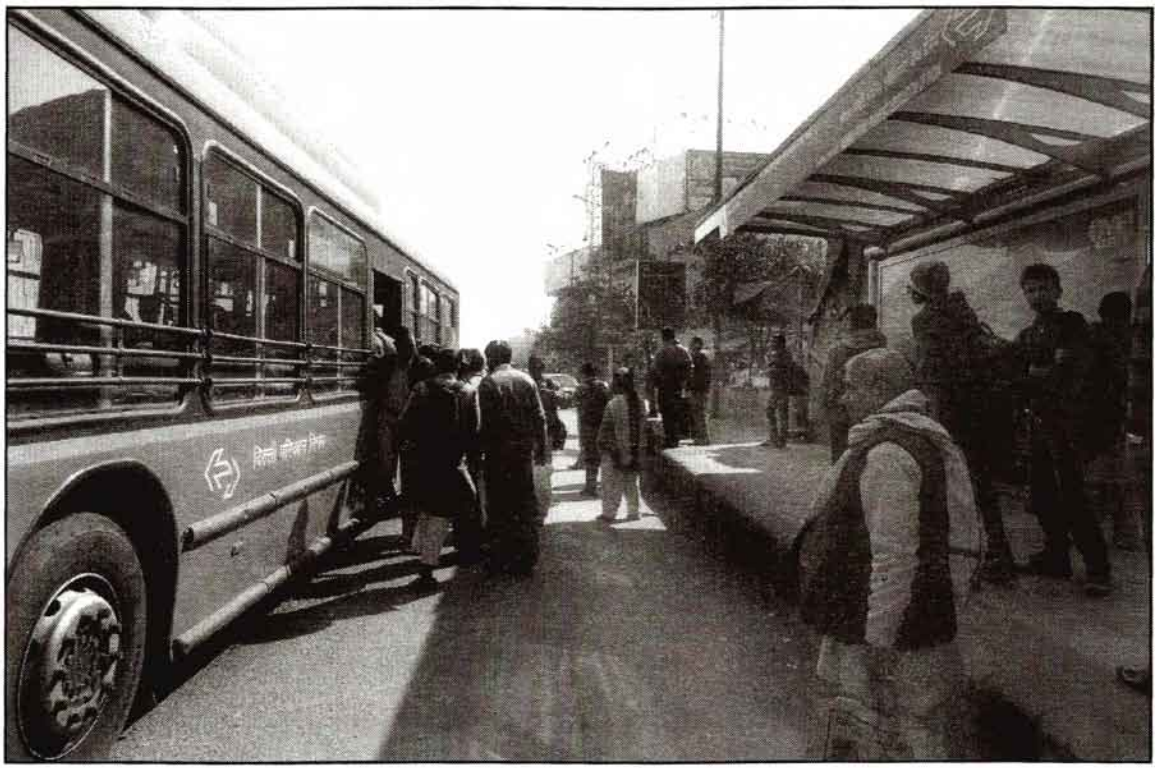

মুনিরকা বাস স্টপ

পুলিশেরা নিজেদের মধ্যে তর্কাতর্কি করতে লাগল কোন থানার অধীনে ঘটেছে এই ঘটনা, তাই নিয়ে। কারও মনে হল না, আমাদের শরীরে একটা করে কাপড় জড়িয়ে দেয় বা একটা অ্যাম্বুল্যান্স ডাকে। বহুবার বলার পর কেউ একজন একটা বেডশিটের কিছুটা অংশ দিল আমার বান্ধবীর শরীর ঢাকার জন্য।

আমার বান্ধবীর শরীর থেকে এত রক্ত বেরিয়ে যাচ্ছিল, নিজের আঘাত ভুলে আমি তখন ওর জন্যই উদ্বিগ্ন ছিলাম। কিন্তু কাছাকাছি হাসপাতালে নেওয়ার বদলে পুলিশ আমাদের নিয়ে গেল বেশ দূরে, সফদরজং হাসপাতালে।

সিনেমা দেখতে খুব ভালোবাসত দামিনী। কিছুক্ষণের বিনোদন, তার প্রিয় তারকাদের অভিনয়, ভুলিয়ে দিত জীবনের হাজারো টেনশন, হাজারো কমিটমেন্টের চাপের কথা। তাই নতুন কোনও ফিল্ম শহরে এলেই সময় সুযোগ করে দেখতে ছুটত হলে।

সেদিনও, সেই ১৬ ডিসেম্বর রবিবার সন্ধেতেও অভেন্দ্রকে সঙ্গে নিয়েই দক্ষিণ দিল্লির সাকেত মলে সিনেমা দেখতে গেছিল দামিনী। আর ফিল্ম দেখে ফেরার পথে রাজধানীর বুক চিরে তারই রক্তের ভাষায় লেখা হল চিরদিনের এক কলঙ্কিত ইতিহাস।

মেয়েটির মায়ের কথা অনুযায়ী, সেদিন ওদের সিনেমা দেখতে যাওয়ার কথা ছিল না। রবিবার, ছুটির দিন। দুজনে কী সব কাজ নিয়ে বেরিয়েছিল। নির্দিষ্ট সময়ের আগেই কাজ শেষ হয়ে যাওয়ায়, দুজনে ঠিক করে ইভনিং শো-তে একটা সিনেমা দেখবে। সিনেমা দেখে বেরোতে বেরোতে ঘড়ির কাঁটা দশটার দিকে এগিয়ে যায়...আর তারপরই ঘটে গেল সেই বিপর্যয়...

চার

এরপরের ঘটনাগুলো খুব দ্রুত ঘটে গিয়েছিল। ১৬ থেকে ২৯ ডিসেম্বর, মাত্র ১৩ দিনের এক অতিমানবীয় জীবন-সংগ্রাম—যার সঙ্গে মিশে গেল সারা দেশের প্রার্থনা, কষ্ট, হতাশা, ক্রোধ। এই নারকীয় ঘটনার বিরুদ্ধে মানুষের ধিক্কার আর ক্ষোভের নজিরবিহীন সমবেত প্রতিবাদে শোনা গেল বিপ্লবের ঘণ্টাধ্বনি। যার পরিধি বিস্তৃত হল দেশের গন্ডি ছাড়িয়ে বিশ্বের দরবারেও।

মহিপালপুর সেতুর নীচে ঝোপজঙ্গলের মধ্যে মেয়েটি এবং তার সঙ্গী যুবকটিকে রক্তাক্ত, মারাত্মক জখম অবস্থায় প্রথম পড়ে থাকতে দেখে টোল প্লাজার টহলদারী ভ্যান। তারা পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশের গাড়িতে দুজনকে নিয়ে যাওয়া হয় এইমস্-এ। কিন্তু মেয়েটির অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে সেখান থেকে সরিয়ে নেওয়া

আমি নিজে আমার বান্ধবীকে পাঁজাকোলা করে ভ্যানে তুললাম। পুলিশেরা কোনও সাহায্যই করল না। বোধহয় জামাকাপড়ে রক্ত লেগে যাওয়ার ভয়ে। আশেপাশে জড়ো হওয়া মানুষেরাও কেউ এগিয়ে এল না। পাছে প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে থানা বা কোর্টে যেতে হয়।

হাসপাতালে পৌঁছেও অপেক্ষা করতে হল বেশ কিছুক্ষণ। তখনও আমি কাপড় চেয়ে যাচ্ছি আমাদের দুজনের জন্য। এক সাফাইকর্মীকে ধরলাম। সে বলল ছেঁড়া পর্দা নিয়ে আসছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাও এল না। উপায় না দেখে, অপরিচিত একজনের

মোবাইল থেকে ফোন করলাম আত্মীয়দের। এটুকুই বললাম, দুর্ঘটনায় পড়েছি। আমার আত্মীয়স্বজন না এলে পরবর্তীকালেও আমার চিকিৎসা হত কিনা সন্দেহ। আমার মাথায় আঘাত লেগেছিল,

হয় সফদরজং হাসপাতালে। দামিনীর সঙ্গী সেই যুবক রাত সওয়া একটা নাগাদ বসন্তবিহার থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। ধর্ষণের পর মত্ত সেই ছ'জন মেয়েটির যৌনাঙ্গে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছিল লোহার শিক, গাড়ি মেরামতির যন্ত্রপাতি। পিটিয়ে ভেঙে দিয়েছিল মেয়েটির কাঁধ ও গোড়ালির হাড়। কী তার অপরাধ, না, সে বাধা দিয়েছিল, চরম লাঞ্ছনার মুখে সপাটে চড় কষিয়েছিল এক ধর্ষকের গালে। ১৬ ডিসেম্বর রাতেই তাঁর অস্ত্রোপচার করেন

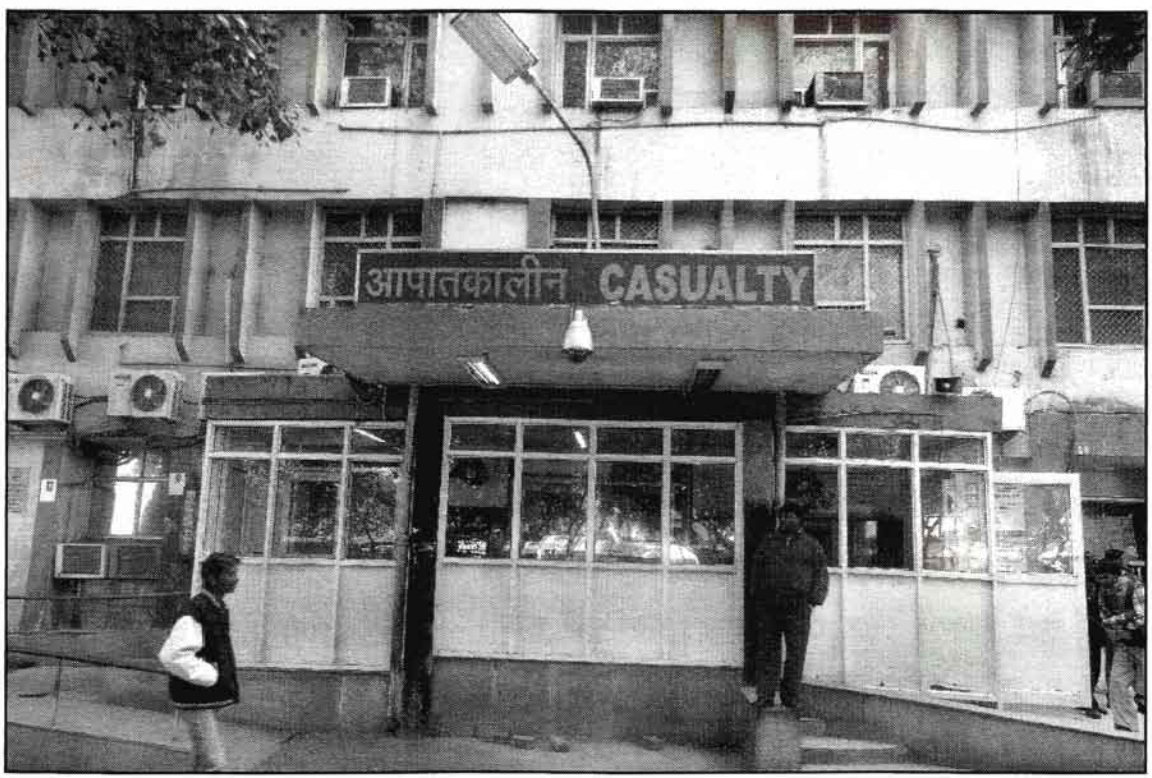

সফদরজং হাসপাতালের Casualty Dept., যেখানে দামিনীকে প্রথম নিয়ে আসা হয়েছিল

চিকিৎসকেরা।

বুধবার ১৯ ডিসেম্বর আরও একটি অস্ত্রোপচার করা হল। অত্যাচারের সময় দেহের ভেতর লোহার রড ঢুকিয়ে দেবার কারণে ক্ষত-বিক্ষত অন্ত্রে সংক্রমণ শুরু হয়েছিল। ফলে ৬ মিটার লম্বা অন্ত্রের প্রায় পুরোটাই কেটে বাদ দিতে হল।

ইতিমধ্যেই হাসপাতালে তার বাবা-মা, পরিবারের সবাই এসে গিয়েছিলেন। ১৯ ডিসেম্বর দ্বিতীয়বার অপারেশন

হাঁটতেও পরছিলাম না। হাত নাড়াতে পারিনি দু'সপ্তাহ। আমার বাড়ির লোকেরা বারবার বলছিল গ্রামে চলে যেতে, কিন্তু আমি দিল্লিতেই থাকতে চেয়েছি, পুলিশকে তদন্তে সাহায্য করার জন্য। ডাক্তারেরা বলার পর

বসন্তবিহার থানা, যেখানে প্রথম এফ.আই.আর. করা হয়

তবেই আমি এসেছি
গ্রামের বাড়িতে।
এখানেও চিকিৎসা
চলছে।
হাসপাতালের বেডে
যখন শুয়ে আছে আমার
বান্ধবী, আমার সঙ্গে
দেখা হতে হাসল,
লিখতেও পারছিল।
কখনও মনে হয়নি ওর
বাঁচার ইচ্ছে নেই। বরং
খুব পজিটিভ লেগেছে
ওকে। একটুকরো কাগজে
আমাকে লিখে জানাল,
আমি সঙ্গে না থাকলে
থানায় যেতই না। আমি
কিন্তু প্রথম থেকেই ভেবে
নিয়েছিলাম, অপরাধীদের
শাস্তি যাতে হয় সেটা
দেখবই। ওর চিন্তা ছিল
চিকিৎসার খরচ নিয়েও।
বুঝতে পারছিলাম,
আমাকে পাশে পেতে

থিয়েটারে ঢোকার আগে মাকে প্রথমবার দেখেছিল দামিনী। চেতন-অচেতনের মাঝখানে শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে ঘোর লাগা দুটি চোখ জলে ভরে উঠেছিল তার। জড়ানো স্বরে কাঁপা কাঁপা হাতটা তুলতে চেষ্টা করে মাকে সে বলেছিল, 'মা, ম্যায় জিনা চাহতি হুঁ'।

প্রথম দিকে ওষুধে খুব একটা সাড়া দিচ্ছিল না দামিনী। ক্রমশই অবস্থার অবনতি হচ্ছিল। মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ার অসম যুদ্ধে দাঁতে দাঁত চেপে শুধুমাত্র মনের জোরে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল দামিনী। যৌনাঙ্গ সহ শরীরের বেশ কিছু প্রত্যঙ্গ তখনই স্থায়ীভাবে নষ্ট হয়ে গিয়েছে তার, তবুও অদম্য মনোবল। ওই অবস্থাতেই পুলিশকে বিশদে জানিয়েছে সেই নারকীয় অভিজ্ঞতা। সেই কালো রাত্রির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ সে জবানবন্দিতে জানিয়েছে, যা রেকর্ড হয়েছে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে।

একবার নয়, দু-দুবার গোটা ঘটনার জবানবন্দি দিয়েছে সে। তারপর সেই বয়ানে কাঁপা কাঁপা অশক্ত হাতে দৃপ্ত সইও করেছে। সাহস আর মনের জোর কোন সীমাহীন স্তরে পৌঁছলে এ অসাধ্য-সাধন সম্ভব! পৃথিবী নামক ভূ-খণ্ডের অধিবাসীদের কাছে এ এক চরম বিস্ময় হয়ে থাকবে চিরকাল।

১৬ ডিসেম্বর রাতে সফদরজং হাসপাতালে ভর্তি হবার প্রথম দিনটি থেকেই যিনি সর্বক্ষণ মেয়েটির পাশে পাশে

থেকেছেন, দামিনীর অবিশ্রাম লড়াইয়ে নিজেও কখন যেন জড়িয়ে গেছেন, সেই ডাক্তার যতীন মেহতা আর তাঁর সহকর্মীরা সকলেই বিস্মিত হয়েছেন বারবার। শরীরের ওই মারাত্মক অবস্থায় কোন দুর্মর সাহসের বলে ম্যাজিস্ট্রেটকে জবানবন্দি দিতে পারল দামিনী, তা ভেবে বিহ্বল হয়েছেন।

যতীন বলেছেন, 'পৃথিবীর ইতিহাসে এই সাহস—এই সংগ্রামী মনোভাব হয়তো বিরল!' মুক্ত কণ্ঠে বারবার স্যালুট জানিয়েছেন ওই নির্ভয়াকে। বলেছেন, 'তুমি আমাদের এই চাইছে ও, মানসিক শান্তির জন্য।

সত্যি বলতে কী, ওর ওপর যে কী নারকীয় অত্যাচার হয়েছিল, তার খুঁটিনাটি আমি জানতে পারি যখন ও প্রথম জবানবন্দি দিল মহিলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে। আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না।

সফদরজং হাসপাতালের Intensive Care Unit, যেখানে মেয়েটির অস্ত্রোপচার হয়েছিল পরপর।

পশুরাও যখন শিকার ধরে, এমন পাশবিক হয় না। ও ম্যাজিস্ট্রেটকে বলেছিল, অপরাধীদের যেন ফাঁসি না দেওয়া হয়, তাদের যেন পুড়িয়ে মারা হয়। প্রথম জবানবন্দির সময় খুব কষ্ট করে কথা বলছিল ও। বারবার কাশি আসছিল, রক্ত উঠছিল

ভারতবর্ষের সাহসিকতার প্রতীক হয়ে রইলে।' শুধু চিকিৎসক বা পুলিশ নয়, সারা ভারত সেলাম জানিয়েছে দামিনীকে, অগণিত জনতা নতমস্তকে কুর্নিশ করেছে ভারতকন্যাকে।

প্রথমে দুজন, পরে আরও দুজন এবং শেষে বাকি দুজন, মোট ৬ জন অভিযুক্ত ধরা পড়ল পুলিশের হাতে। অভেন্দ্র পান্ডের বয়ান এবং রাস্তার সি.সি. টিভি-র বিভিন্ন ফুটেজ থেকে প্রথমে বাসটিকে শনাক্ত করা হয়। তারপর একে একে অভিযুক্তরা ধরা পড়ে। দিল্লি পুলিশের ডেপুটি

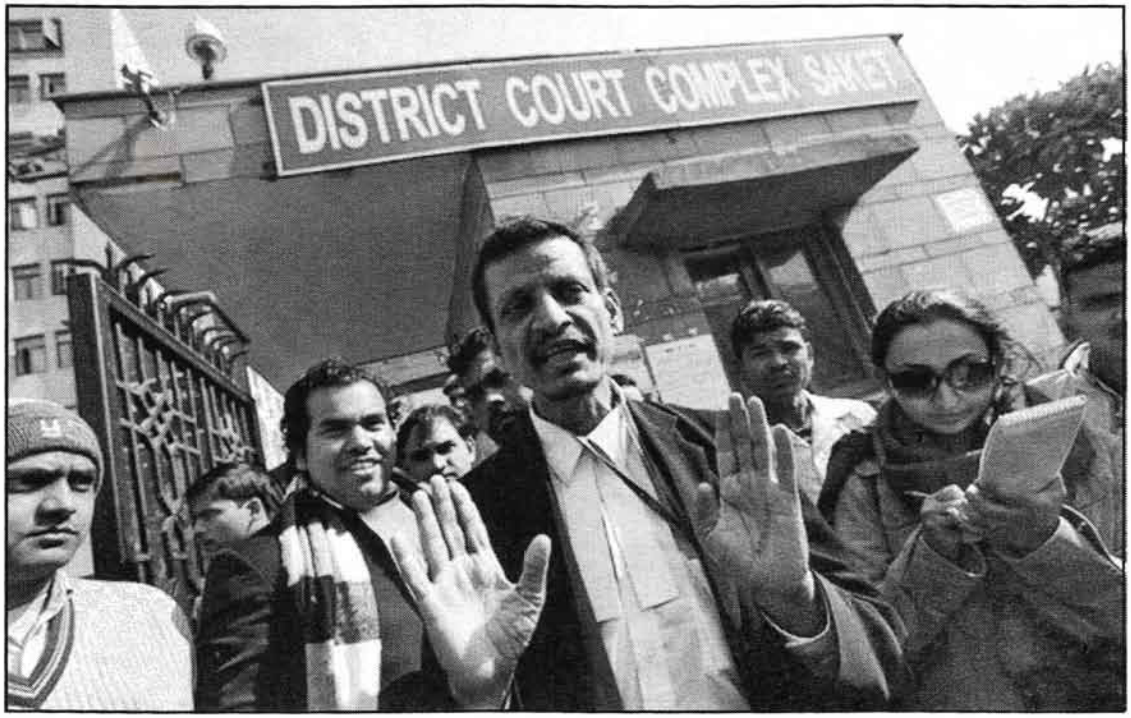

সাকেত কোর্ট

কমিশনার জানান, সেই রাতে ওই বাসের ছয় অভিযুক্তই মদ্যপ অবস্থায় ছিল। প্রধান অভিযুক্ত ওই বাসেরই চালক রাম সিং। অন্যান্য অভিযুক্তরা হল,—রাম সিং-এর ভাই মুকেশ, জিম প্রশিক্ষক বিনয় শর্মা, ফল বিক্রেতা পবন গুপ্তা, অক্ষয় সিং ওরফে ঠাকুর নামে একজন, যে দিল্লিতে এসেছিল চাকরীর খোঁজে। এবং রাজু নামের একটি কমবয়সী ছেলে। যে নিজেকে ১৮ বছরের কম বলে পুলিশের কাছে দাবি করেছে। যদিও সেদিনের সেই কলঙ্কিত রাতে, তার ভূমিকাই ছিল সব থেকে নির্মম—সব চেয়ে ঘৃণিত।

মাঝখানে সামান্য একটু সুস্থ হয়েছিল মেয়েটি। চিকিৎসায় অল্প অল্প সাড়া দিচ্ছিল। নিজেই শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পারছিল। চিরকুটে অল্প লিখতেও পারছিল। বলছিল টুকরো টুকরো কথাও। অবাক হয়েছিলেন চিকিৎসকেরা। এত মনের জোর! এত সাহস তেইশের তারুণ্যের!

অবস্থা একটু স্থিতিশীল দেখে ২১ ডিসেম্বর, শুক্রবার ভেন্টিলেশন থেকে দামিনীকে বের করে আনা হল। আশা জাগল তামাম ভারতবাসীর মনে।

মুখ দিয়ে। ভেন্টিলেটরে দিল তখন। কোনও চাপ ছিল না কিন্তু ওর ওপর। কেন যে এরকম কথা উঠল, কে জানে! এত কষ্ট করার কী মানে হল তাহলে?

পুলিশের উচিত একটা ব্যাপার নিশ্চিত করা—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যেন নির্যাতিতাকে হাসপাতালে নেওয়া যায়। সরকারি হাসপাতালের খোঁজে সময় নষ্ট যেন না হয়। আর একটা কথা, প্রত্যক্ষদর্শীদের মনে ভরসা জাগাতে হবে যে তাদের কোনওরকম হয়রানি হবে না। তবেই আদালতে সাক্ষ্য দিতে আসবে তারা।

মোমবাতি জ্বালিয়ে মানসিকতার পরিবর্তন

সম্ভব নয়। পথে চলার সময় কেউ বিপদে পড়েছে দেখলে, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। আগামী প্রজন্মের জন্য দরকার এই পরিবর্তন। বিচারপতি বর্মা, বিচারপতি লীলা শেষন আর গোপাল সুব্রমনিয়মের প্রতি আমার বিনীত নিবেদন, অনেক আইন আছে দেশে। কিন্তু সাধারণ মানুষ পুলিশের কাছে যেতে ভয় পায়— এফ আই আর নেবে কি নেবে না। একটা ঘটনার প্রেক্ষিতে ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট চালু করেছেন। সব মামলা কেন ফাস্ট ট্র্যাকে হবে না?

আমিই শুধু জানি, কী নারকীয় অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এসেছি। সরকারের তরফে কেউ আমার সঙ্গে

পাঁচ

দামিনীর ওই তেরো দিনের লড়াইয়ের সাক্ষী থেকেছে গোটা দেশ—গোটা বিশ্ব। অসহ্য যন্ত্রণাকে উপেক্ষা করে বেঁচে থাকার প্রবল ইচ্ছেশক্তি কীভাবে চালু রাখে শ্বাস-প্রশ্বাস—দেখেছে অগণিত মানুষ। একটি মেয়ের সঙ্কটজনক অবস্থার সংবাদ যেভাবে উত্তাল করে তুলেছিল গোটা দেশকে, দেখে অবাক পৃথিবী। তসলিমা নাসরিন তাঁর কলম থেকে কবিতার ভাষায় প্রতিবাদ ছুঁড়ে দিলেন নাগরিক চেতনার মূলে। লিখলেন,

'সেই মেয়েটি ইস্কুলে যায়, যাচ্ছে মহাকাশে।
যত্ন করে একুশ শতক তাকেই ছেঁড়ে...বাসে।'

২১ ডিসেম্বর দিনভর অগ্নিগর্ভ ছিল রাজধানী। শুধু রাইসিনা হিলসের রাষ্ট্রপতি ভবনই নয়, গণধর্ষণকে ধিক্কার

জানিয়ে এদিন বিক্ষোভ দেখানো হয় সুপ্রিম কোর্ট, প্রধানমন্ত্রীর দফতর, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এবং ১০ নম্বর জনপথের সামনেও। বিভিন্ন নারীসংগঠন ও ছাত্রছাত্রীরা বিক্ষোভ দেখান ইণ্ডিয়া গেট, যন্তর-মন্তর ও সফদরজং হাসপাতাল সংলগ্ন অঞ্চলে। বিক্ষোভ দেখা যায় বিজয় চকেও। MY BODY MY RIGHT / MY CITY MY RIGHT লেখা পোস্টার-প্ল্যাকার্ড নিয়ে প্রায় পাঁচশো বিক্ষোভকারী রাইসিনা হিলসের কাছে জড়ো হন। কিন্তু মূল ফটকের আগেই তাঁদের আটকে দেয় নিরাপত্তারক্ষীরা। জমায়েত হওয়া বিক্ষোভকারীদের মধ্যে থেকে একটি মেয়ে তীক্ষ্ণ প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়, 'পুলিশ

যোগাযোগ করেনি। আমার চিকিৎসার খরচও আমিই দিচ্ছি। আমাদের সমাজে এ'ধরনের ঘটনা ঘটলে আমরা লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করি। অন্যে কী বলবে, এই ভয়ে গোপন করার চেষ্টা। আত্মীয়-বন্ধুরা আড়ালে এমন আলোচনা করে এসব নিয়ে, আমরা ভয়

পাই সেসব। সেদিন যদি আমি পুলিশে অভিযোগ জানানোর সিদ্ধান্ত না নিতাম, যদি নিছক দুর্ঘটনা বলে উড়িয়ে দিতাম, প্রতিবাদ এত বড় আকার নিত না। আমার নিজের মানসিক অবস্থা এমন হয়েছিল বেশ কিছুদিন যে ঘুমোতে পারিনি রাতের পর রাত। আমারই কি তবে দোষ? কেন গেলাম শপিং মলে? কেন উঠলাম ওই বাসে?

দীর্ঘমেয়াদী একটা যুদ্ধ চলবে এখন। আমার পরিবারে আইনজীবী না থাকলে, লড়া অসম্ভব ছিল। এখন চারদিকে এত প্রতিবাদ। মেট্রো স্টেশন বন্ধ করে কী হবে? জনতার মতপ্রকাশের অধিকার কেড়ে নেওয়া যায়?

বলছে, ভিতরে ঢুকতে অনুমতি লাগবে। অনুমতি লাগবে কেন? আমরা যখন নিগৃহীতা হই, তখন তো কেউ অনুমতি চায় না। আমরা এখানে আমাদের কথা বলতে এসেছি। আমাদের বলতে দেওয়া হোক।'

এঁদের সঙ্গে যোগ দেন এক সুইডিশ মহিলাও। পাশে দাঁড়াতে দেখা যায় অস্ট্রেলিয়ার সমব্যথী প্রবাসীদেরও।

এর আগেই ১৯ ডিসেম্বর দামিনীকে দেখতে হাসপাতালে যান লোকসভার অধ্যক্ষ মীরা কুমার। তার মায়ের সঙ্গে ও কথা বলেন তিনি। সেখানেই তিনি শোনেন মেয়েটির পরিবারের অপরিসীম দারিদ্র্যের কথা। দু-বেলা দু-মুঠো অন্নের সংস্থান করতে তাঁদের কীভাবে প্রাণপাত করতে হয়। অতিকষ্টে কোনওমতে মেয়ের উচ্চশিক্ষার সাধপূরণের স্বপ্ন দেখেছিলেন তাঁরা। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে মীরা কুমার ওই দিন বলেছিলেন, 'ও আমাদের দেশের সম্পদ, ভারতের অহংকার! আমাদের ভারতবর্ষের হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণশক্তি দিয়ে ওকে আমাদের বাঁচিয়ে তুলতেই হবে।'

আর ওই দিনই দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী শীলা দীক্ষিতের বাড়ির সামনে বিক্ষোভে সামিল হন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল ছাত্রছাত্রী। ধর্ষণকারী ছয় অভিযুক্তের ফাঁসির দাবিতে স্লোগান দিতে দিতে হঠাৎই তাঁরা পুলিশ ব্যারিকেড ভেঙে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের দিকে এগোতে থাকেন। নিমেষে অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আনতে শেষ পর্যন্ত জলকামান ছুঁড়তে হয় পুলিশকে। একদিকে মোমবাতি

হাতে শান্তি মিছিল, অন্যদিকে বিক্ষোভে সরব, জানুয়ারি জুড়ে এই ছিল দিল্লির চেহারা। পুলিশের সঙ্গে বারবার সংঘাত হয়েছে ক্ষিপ্ত জনতার। সেসব ঘটনার জেরে ২৩ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'মানুষের রাগ ও যন্ত্রণার সঙ্গত কারণ আছে। পুলিশ এবং প্রতিবাদীদের মধ্যে যেভাবে বারবার সংঘর্ষ হয়েছে, তাতে আমি অত্যন্ত ব্যথিত। কথা দিচ্ছি, দেশ জুড়ে মহিলাদের নিরাপত্তা দিতে আমরা সবরকম ব্যবস্থা নেব।'

প্রশাসনের ওপর সাধারণের আস্থা ফেরানো দরকার। ও আমাদের জাগিয়ে দিয়ে গেছে। যুদ্ধটা যদি চালিয়ে নিয়ে যেতে পারি, তাহলেই ওকে যথার্থ শ্রদ্ধা জানানো হবে।

সফদরজং হাসপাতালের মূল ফটক এবং বিল্ডিং

২২ ডিসেম্বর, শনিবারেও জনতা-পুলিশ খন্ডযুদ্ধে উত্তাল রাজধানীর ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে দেশের অন্য শহরেও। সর্বত্রই প্রতিবাদের এক সুর, 'ধর্ষণকারীদের ফাঁসি চাই।' এদিন মিছিলে যোগ দেন প্রাক্তন সেনাপ্রধান ভি. কে. সিং। প্রতিবাদে সামিল হন দেশের বিশিষ্ট মানুষেরা।

প্রতিবাদের তীব্রতা এদিন চরমে উঠেছিল। রাজধানীর বুকে বিক্ষোভের আগুন যে এভাবে ক্রমশ বাড়তে থাকবে, সম্ভবত তা আগাম আন্দাজও করতে পারেনি দিল্লি পুলিশ। বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ও জল-কামান ব্যবহার করছিল। পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে কয়েকজনকে আটকও করা হয়। তখনই উত্তেজনা তুঙ্গে ওঠে। পুলিশকে লক্ষ্য করে পাথর, ইঁট-পাটকেল, জুতো ছোঁড়েন বিক্ষোভকারীরা। পুলিশের কয়েকটি গাড়ি ও সরকারি বাসও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পুলিশ তখন পালটা লাঠিচার্জ করে। আহত ২০ জন ছাত্রকে দিল্লির বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

বিক্ষোভ সামলাতে গিয়ে গুরুতর আহত হন ৪৫ বছর বয়সি এক পুলিশ কনস্টেবল সুভাষচন্দ্র। ২৫ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার, ভোর ৬টা ৪০ মিনিটে, দিল্লির আর এম এল হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়।

২৪ ডিসেম্বর থেকেই দামিনীর শারীরিক অবস্থা আবার একটু একটু করে অবনতির দিকে যেতে থাকে। অন্ত্রে সেপসিস বা পচন শুরু হয়ে গিয়েছে ততক্ষণে। ২৫

প্রণব মুখোপাধ্যায়,
রাষ্ট্রপতি

‘মেয়েটি আজকের সমাজে আসল হিরো। নির্ভীকভাবে লড়ে গিয়েছে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। তাঁর এই লড়াই ভারতের যুব সমাজ এবং মহিলাদের কাছে একটা প্রতীক হয়ে থাকবে। ভারত একজন সাহসী মেয়েকে হারাল। এই তরুণীর দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যুতে শোকাহত হয়েছি। তাঁর মৃত্যু বৃথা যাবে না।’

ডিসেম্বর, মঙ্গলবার তাকে আবার ভেন্টিলেশনে দেওয়া হয়। রক্তকণিকা-রক্তচাপ মারাত্মকভাবে কমে আসছে তখন। বাইরে থেকে রক্ত, অনুচক্রিকা, প্লাজমা দিতে হচ্ছে। রক্তে বিলিরুবিনের মাত্রা অত্যধিক। সংক্রমণ বেড়ে চলেছে। ওই মঙ্গলবারেই হৃদযন্ত্রে রক্তের একটি ক্লট তৈরি হয়, সেটি ফুসফুস পর্যন্ত চলে আসে। এর ফলে প্রায় ৩-৪ মিনিট তার কোনও রক্তচাপ পাওয়া যাচ্ছিল না।

বুধবার, ২৬ ডিসেম্বর কয়েক সেকেন্ডের জন্য স্তব্ধ হয়ে যায় তার হৃদ্‌যন্ত্র। পর পর তিনটি হার্ট অ্যাটাক হয়। এরপরই বুধবার সন্ধেবেলা গুরগাঁওয়ের মেদান্ত মেডিসিটি হাসপাতালের কার্ডিওভ্যাসকুলার স্পেশালিস্ট নরেশ ত্রেহানকে সফদরজং হাসপাতাল থেকে ডেকে পাঠানো হয়। সঙ্গে ছিলেন ক্রিটিক্যাল কেয়ার স্পেশালিস্ট যতীন মেহতা। তাঁরা দেখেন, গত দশ-এগারো দিনের মধ্যে তিনটি বড় অস্ত্রোপচারে যদিও তার ক্ষুদ্রান্তের ৯৫ শতাংশই কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে, তবুও অবশিষ্ট অন্ত্র, তলপেট ও যৌনাঙ্গে ভয়াবহ সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়েছে। তখনই তাকে সিঙ্গাপুরে মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়।

২৬ ডিসেম্বর রাতেই দামিনীকে বিশেষ এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয় সিঙ্গাপুর।

এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে মেয়েটির সঙ্গে ছিলেন ডাঃ যতীন মেহতা, মেদান্ত মেডিসিটি হাসপাতালের দুজন জুনিয়র ডাক্তার, একজন নার্স এবং সফদরজং হাসপাতালের

মনমোহন সিং,
প্রধানমন্ত্রী

‘ভয়ংকর ক্ষতি হয়ে গেল। তবু ওঁর বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয় পরিজনের কাছে দেশের একজন নাগরিক হিসাবে জানাই আমার গভীর শোকবার্তা। জীবন-যুদ্ধে ওঁর হেরে যাওয়াটাকে কোনওভাবে মন মানতে চাইছে না। আমি ওঁর পরিজনের সঙ্গে কথা বলব। সমস্ত রাজনৈতিক দল এবং নাগরিক সমাজকে সঙ্কীর্ণ স্বার্থের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। সমাজের মানসিকতায় পরিবর্তন নিয়ে বিতর্ক তৈরি করা প্রয়োজন।’

সোনিয়া গান্ধি,
চেয়ারপার্সন, ইউপিএ

‘আমরা শপথ নিচ্ছি, মেয়েটি বিচার পাবেন। তাঁর লড়াই বিফলে যাবে না। সকলেরই মনে হচ্ছে তাঁর মেয়ে বা বোন মারা গিয়েছেন।’

একজন সিনিয়র ডাক্তার। মোট পাঁচজনের একটি মেডিকেল টিম। বাবা বদ্রি সিং, মা আশাদেবী আর ভাই গৌরবকে তড়িঘড়ি পাসপোর্ট তৈরি করে দেয় সরকার, যাতে তারা যেতে পারেন দামিনীর সঙ্গে।

বিমানে ফুসফুসের অবস্থার বেশ অবনতি হয়। এক সময় রক্তচাপও আর পাওয়া যাচ্ছিল না। তখন চিকিৎসকেরা আর্টেরিয়াল লাইন করে রক্তচাপ মনিটরে দেখতে শুরু করেন। প্রথমে তাকে ৬০ শতাংশ ভেন্টিলেশনে রাখা হয়েছিল, পরে তা বাড়িয়ে ৭০ শতাংশ করা হয়। এরপর

সিঙ্গাপুরের মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতাল

বিমানে দামিনীর অবস্থা মোটামুটি স্থিতিশীল অবস্থায় আসে।

সিঙ্গাপুর বিমানবন্দরে নামার পর দ্রুত তাকে মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে প্রথমেই তার পুরো শরীরটা স্ক্যান করা হয়। তারপর সর্বোচ্চ ভেন্টিলেশন ও অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে রাখা হয় তাকে। মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালের প্রধান কেলভিন লোহ-এর নেতৃত্বে ওখানকার চিকিৎসক টিমের সঙ্গে ডঃ যতীন মেহতা টিমের জরুরি আপৎকালীন তিনটি দীর্ঘ বৈঠকও হয়।

ঠিক হয়েছিল, শারীরিক অবস্থা একটু স্থিতিশীল হলে, তবেই অঙ্গ প্রতিস্থাপন করা হবে। সিঙ্গাপুরের এই মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতাল মাল্টিঅরগ্যান প্রতিস্থাপনের জন্য বিখ্যাত।

কিন্তু সে সুযোগ আর পাওয়া গেল না। মাউন্ট এলিজাবেথে নিয়ে যাওয়ার পর, আর মাত্র ৪৮ ঘণ্টা বেঁচে ছিল দামিনী।

অবস্থা দ্রুত আশঙ্কাজনক দিকে যেতে থাকে। সংক্রমণ গোটা শরীরে ছড়িয়ে পড়তে থাকে, বিশেষ করে মস্তিষ্কে। শরীর থেকে অনেক রক্ত বেরিয়ে গিয়েছিল, ফলে প্রচুর রক্তও দিতে হয়েছিল। আর সে জন্যেই শরীরে তরলের তারতম্য দেখা দেয় এবং মস্তিষ্কে জলের চাপ অত্যন্ত বেড়ে যায়। হৃদ্‌যন্ত্র মাত্র ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ কাজ করছিল। বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিকল হয়ে পড়ছিল। রক্তচাপ প্রায়

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়,

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী

‘বেদনাদায়ক ঘটনা। আমরা ছোটবোনকে হারিয়েছি। এমন ঘটনা যেন আর না ঘটে। এই ধরনের ঘটনা রুখতে সব মানুষকে নিয়ে দলমত নির্বিশেষে আরও কঠোর আইন প্রণয়নের দাবি তুলতে হবে। পাশাপাশি জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। দোষীদের এমন শাস্তি হওয়া উচিত যাতে কেউ এমন ঘটনা ঘটানোর সাহস না পায়। সমাজ থেকে এইসব মানুষদের পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করতে হবে।’

মীরা কুমার,
লোকসভার অধ্যক্ষ

‘লড়াইয়ে অনুপ্রেরণার অগ্রদূত একটি মেয়েকে ভারতবাসী ভুলবে না...’

শূন্যে চলে গিয়েছিল। মাল্টিঅরগ্যান ফেলিওর-এর দিকে ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছিল ২৩ বছরের শরীরটা। বিশ্বমানের আটজন আই. সি. ইউ বিশেষজ্ঞের একটি স্পেশ্যাল টিম আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন তাকে বঁচিয়ে রাখার। ‘সেরিব্রাল ইডিমা’ বা মস্তিষ্কে জল জমে যাওয়ার কারণে অবস্থা ক্রমশই আয়ত্বের বাইরে চলে যাচ্ছিল। সেই সঙ্গে সারা শরীর জুড়ে ভয়াবহ সংক্রমণ।

অবশেষে ১৩ দিনের নিরন্তর লড়াই শেষ হল। মৃত্যুর কাছে হার মানল বাঁচার তীব্র আকুতি। পরাজিত হলেন চিকিৎসকেরা, ব্যর্থ হল পৃথিবী জুড়ে অগণিত মানুষের

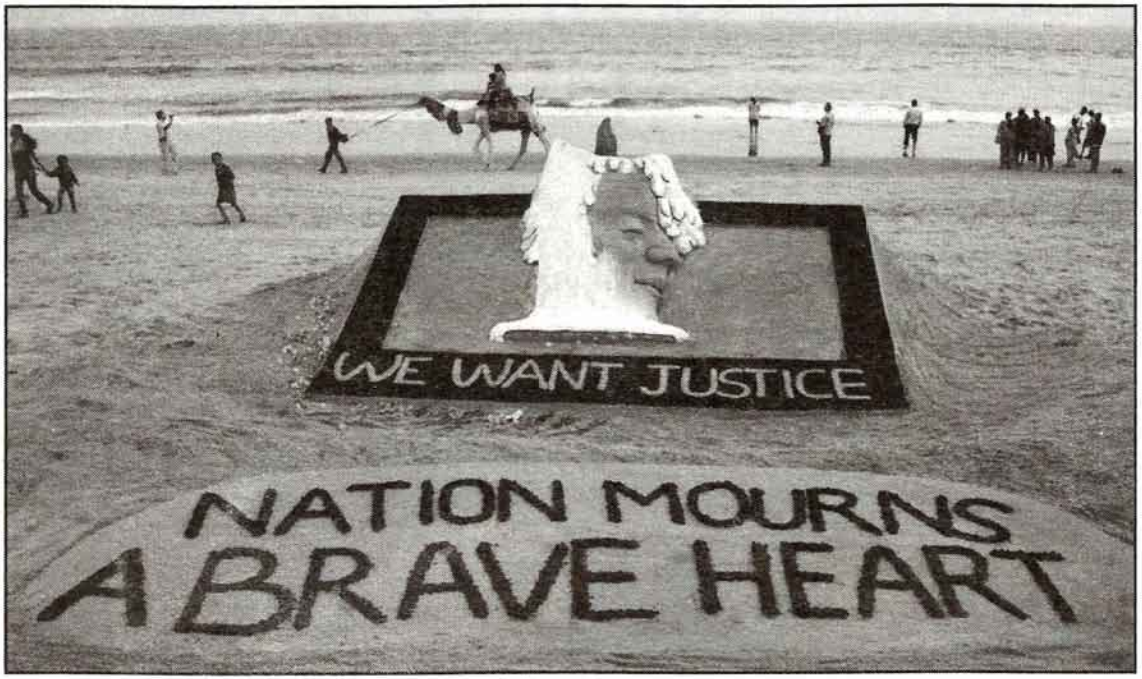

শিল্পীর প্রতিবাদ

প্রার্থনা। কিন্তু পরাজিত হল না প্রতিবাদ! দামিনীর মৃত্যুতে আরও স্পষ্ট, আরও সোচ্চার হল—শক্তিশালী হল সেই গর্জন। আসমুদ্র হিমাচলে—আওয়াজ উঠল—'অপরাধীদের শাস্তি চাই—সর্বোচ্চ শাস্তি—ফাঁসি চাই—!'

শীলা দীক্ষিত,
দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী

'আজ আমাদের হৃদয় পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে। আমরা লজ্জিত। গভীরভাবে আমি শোকাহত। আমাদের আত্মবিশ্লেষণ জরুরী।'

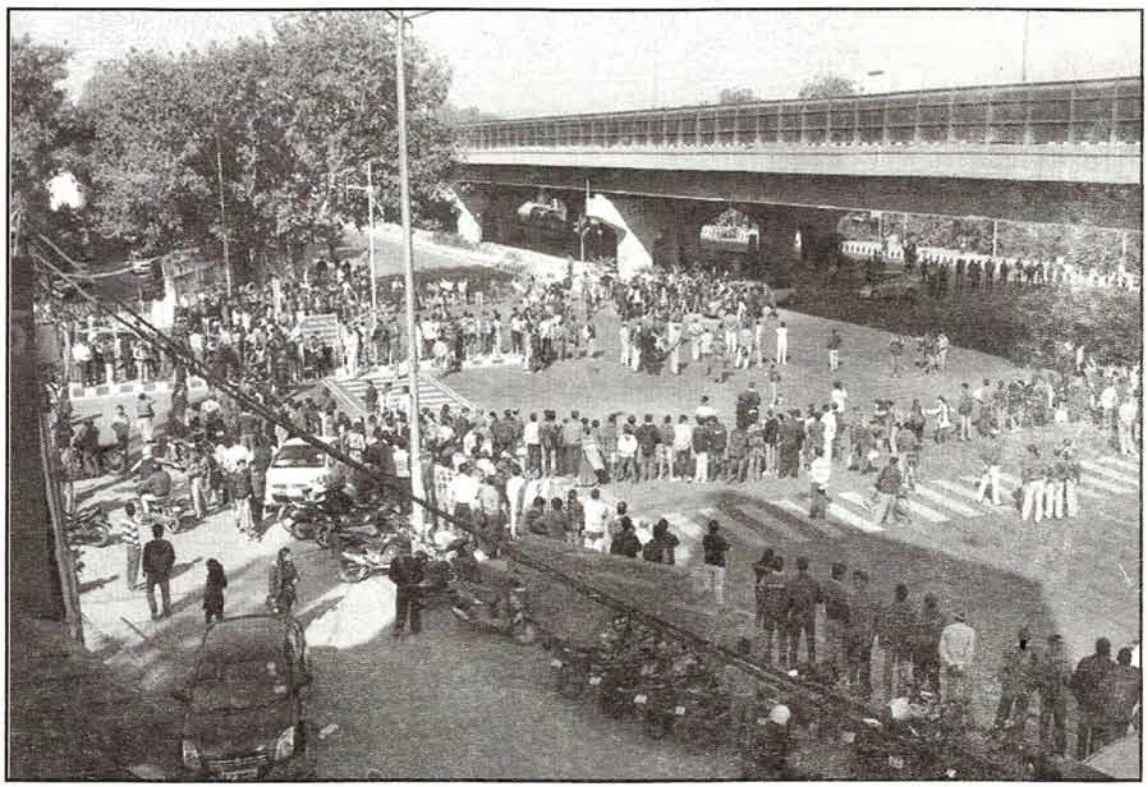

দিল্লিতে মানুষের প্রতিবাদ

ছয়

২৯ ডিসেম্বর ভোর ৪:৪৫ মিনিটে সিঙ্গাপুরের হাসপাতালে, ভারতীয় সময় রাত প্রায় সওয়া দুটোয় এই পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে অনেক দূরের পথ পাড়ি দিল বর্ন ফাইটার ভারত কন্যা। নিভে গেল এক আলোকশিখা। কাঁদল রাজধানী, কাঁদল ভারতবর্ষ, কাঁদল সারা বিশ্ব। শোকের প্রতীক হয়ে, প্রতিবাদের প্রতীক হয়ে ওই নির্ভীক মেয়ে নিজের জীবনের বিনিময়ে প্রতিবাদের গণ-অভ্যুত্থান জাগিয়ে দিয়ে গেল। দেশজুড়ে ধ্বনিত হল যন্ত্রণার নির্ঘোষ—

'WE ARE ASHAMED–SAVE OUR GIRLS...SAVE OUR SISTERS'

সুশীল কুমার শিন্দে,
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

"এই ধরনের অপরাধ দমনে আইনকে আরও শক্তিশালী করার অঙ্গীকার করছি। যাতে করে আগামীদিনে এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয়।"

শোকের ভাষায় মিশে গেল অপরাধীদের উদ্দেশে ঘৃণার ধিক্কার—'CRIMINALS SHOULD BE PUNISHED'...

২৯ ডিসেম্বর মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালের প্রধান কেলভিন লোহ্ আক্ষেপ করে বলেন, 'আমরা হতভাগ্য। মৃত্যুর কাছে, দৈব ইচ্ছার কাছে আমাদের পরাজয় হল। আমরা এত অসহায়! এতদিন সব প্রতিকূলতার সঙ্গে দুর্জয় সাহসকে সম্বল করে লড়াই করেছিল মেয়েটি, কিন্তু শরীরের নিদারুণ যন্ত্রণা মানসিক জোরকে হার মানাল। ছিনিয়ে নিয়ে গেল অচেনা-অজানা কোন সে অমৃতলোকে। বড্ড তাড়াতাড়ি চলে যেতে হল ওকে, আমাদের আরও একটু সুযোগ দিল না।'

২৯ ডিসেম্বর, শনিবার, তখনও 'সূর্য না-ওঠা' ভোরে দামিনীর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ল সারা দেশে। রাজধানী দিল্লিসহ গোটা দেশ বাঁধ না-মানা চোখের জল আর নীরব প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে যেন এক নতুন লড়াইয়ের শপথ নিল। দিনটাকে আপামর ভারতবাসী পালন করতে চাইল অঘোষিত রাষ্ট্রীয় শোকের দিন হিসেবে। সহমর্মী যন্ত্রণায়, বুকের গভীরে অবিরত রক্তক্ষরণের বেদনায় অমিতাভ বচ্চন জানালেন তাঁর প্রতিবাদ মরমী কবিতায়।

শর্মিলা ঠাকুর,
অভিনেত্রী

"ঘটনার ঠিক পরেই সরকারের উচিত ছিল বুক চিতিয়ে মানুষের ক্ষোভের মুখোমুখি হওয়া।"

"সময় চলতে মোমবাতিয়াঁ, জ্বল কর বুঝ জায়েগি...
শ্রদ্ধা মে ডালে পুষ্প, জল হীন মূর্ঝা জায়েঙ্গে...
স্বর বিরোধকে অওর শান্তিকে আপনি প্রবলতা খো দেঙ্গে...
কিন্তু 'নির্ভয়তা' কি জ্বলাই অগ্নি হামারে হৃদয়কো প্রজ্জ্বলিত করেগি...
জল হীন মুর্ঝায়ে পুষ্প কো হামারি অশ্রু ধারায়ে জীবিত রাখেগি...
দগ্ধ কণ্ঠ সে 'দামিনী' কি 'আমানত' আত্মা বিশ্বভরমে গুঞ্জেগি...
স্বর মেরে তুম, দল কুচল কর পিস না পাওগে
ম্যায় ভারত কি মা বহনিয়া বেটি হুঁ,
আদর অওর সৎকার কি ম্যায় হকদার হুঁ...
ভারত দেশ হামারি মাতা হ্যায়,
মেরি ছোড়ো, আপনি মাতা কি তো পহচান বনো!!

অমিতাভ বচ্চন

দামিনী

সময় বইবে, মোমবাতি যাবে পুড়ে
শিখাগুলি যাবে নিভে,
যে ফুল দিয়েছো, জলাভাবে যাবে
সেই ফুলও ধীরে ঝরে,
মৌন অথবা গর্জিত সব
প্রতিবাদও হবে শেষ,
তথাপি হৃদয়ে সবার জ্বলবে
নির্ভয়তার আলো,
সে ফুল আবার বিকশিত হবে
সবার অশ্রুজলে।

তখন 'দামিনী' বা 'আমানত'
সেই মেয়েটির স্বর
বিশ্বে ছড়াবে: আমি ভারতের
জননী, কন্যা, বোন।
মর্যাদা দাও, যেই সম্মান
জন্মের অধিকার
প্রতিটি নারীর, আমি ভারতের
ভারত আমার মা।
আমাকে ভুললে ভুলে যাও, তবু
ভুলো না মায়ের মুখ।

অনুবাদ :
মৃদুল দাশগুপ্ত

২৯শে ডিসেম্বর সারাদিন রাজধানী দিল্লির যন্তরমন্তর থেকে, প্রতিটি রাজপথ। সর্বত্র প্রজ্জ্বলিত মোমবাতি হাতে নিয়ে দামিনীর আত্মার শান্তি কামনায় মিছিল করল জনতা। দক্ষিণ দিল্লির সেই মুনিরকা বাসস্টপ ওইদিন হয়ে উঠল প্রতিবাদ আর শোকের কেন্দ্রবিন্দু। যে বাসস্টপ থেকে সেই অভিশপ্ত রাতে দামিনী ওই বাসে উঠেছিল। ওই বাসস্টপটাই যেন সেদিন হয়ে উঠেছিলো রাজধানী শহরের মেগা লজ্জার এপিসেন্টার। প্রতিবাদী মানুষের ভিড়ে সেদিন ছয়লাপ

জয়া বচ্চন,

সাংসদ

‘আমি নিগৃহীতার পরিবারের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। এই দেশের সমস্ত মহিলার কাছে আমি ক্ষমা চাইছি।’

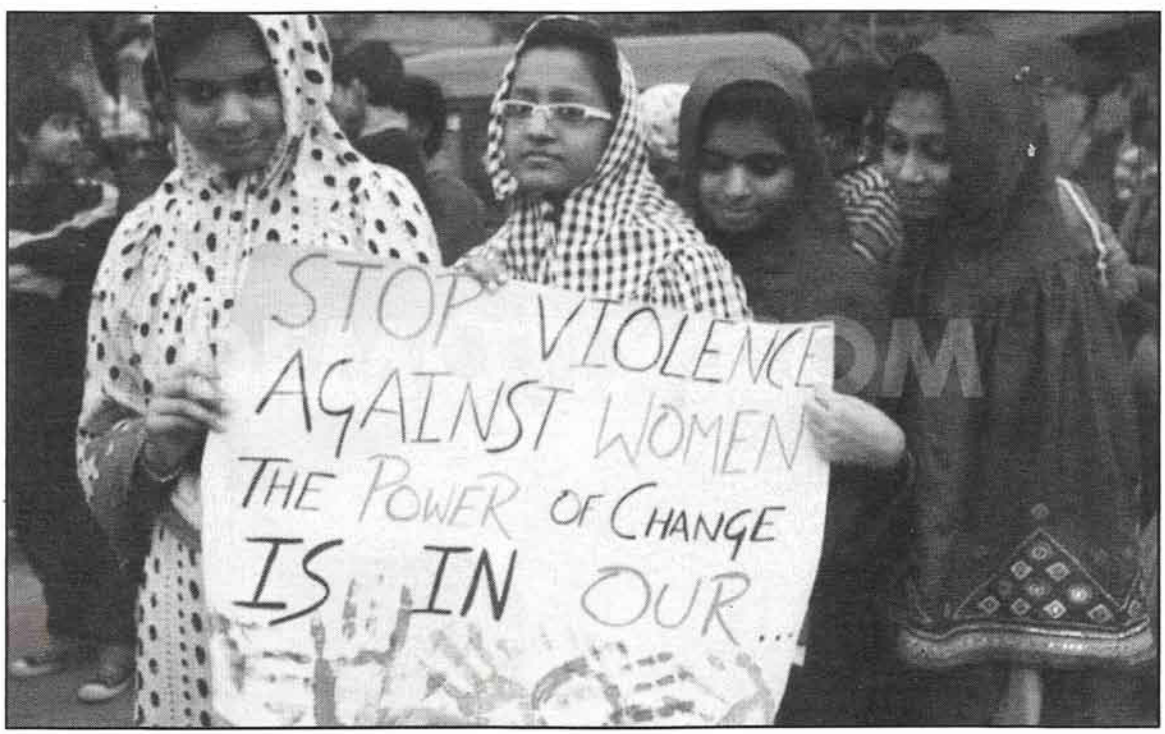

ছিল—মুনিরকা বাসস্টপ।

বর্ষশেষের সপ্তাহান্তে পথে নামল শোকস্তব্ধ কলকাতাও। শহর জুড়ে মৌন মিছিল থেকে নাগরিকেরা সোচ্চার হলেন দোষীদের ফাঁসির দাবিতে। শনিবার শীতের দুপুরে একরাশ পাথরচাপা ক্ষোভ নিয়ে মহানগরী নীরব প্রতিবাদ আর শ্রদ্ধা জানাল তাদের আমানতকে। দলমত নির্বিশেষে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে এদিন বেরোল একাধিক মিছিল। আট থেকে আশি সামিল হল সেই মিছিলে।

শহরের প্রাণকেন্দ্রে হাতে হাতে জ্বলল মোমবাতি। ধর্মতলা থেকে হাজরা মোড়, কিংবা শহিদ মিনারের নিচ থেকে বিড়লা তারামন্ডলের দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলল মিছিল। স্কট লেন, পার্ক স্ট্রিট মোড়, কিংবা নিউ আলিপুর অথবা বেহালার পাড়ায় পাড়ায় একই দৃশ্য। মানুষের হাতে কখনও মোমবাতি—কখনও ফুলের তোড়া কখনও বা পোস্টার, তাতে লেখা 'নিগৃহীতা দামিনীর মৃত্যুতে অপরাধীদের কঠোরতম শাস্তি চাই।' স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদে সামিল হল হাজার হাজার মানুষ, নিজের মতো করে।

বড়দিনের উৎসব উপলক্ষে রাজ্য পর্যটন দপ্তরের

চেতন ভগৎ,
লেখক

‘প্রতিটি ধর্ষণের ঘটনাতেই মৃত্যুদণ্ড হওয়া উচিত কিনা জানি না, তবে এক্ষেত্রে অপরাধীদের চরম সাজা হওয়াই দরকার।’

আয়োজনে আলোর মালায় সাজানো হয়েছিল কলকাতার পার্ক স্ট্রিট। ২৯ ডিসেম্বর, রাজ্য সরকার দামিনীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে বিকেল সাড়ে পাঁচটা থেকে সন্ধে সাড়ে ছ'টা পর্যন্ত পার্ক স্ট্রিটের সব আলো নিভিয়ে দেয়। নিষ্প্রদীপ পার্ক স্ট্রিট যেন মূর্তিমান প্রতিবাদ। শহরের কয়েক জায়গায় সেদিন সাইকেল ও বাইক র‍্যালির মধ্য দিয়ে প্রতিবাদ জানান যুব সম্প্রদায়।

কলকাতার পাশাপাশি রাজ্যের প্রায় সর্বত্রই পুঞ্জীভূত

যুবরাজ সিং,
ক্রিকেটার

‘সমাজে কোথাও বিরাট কোনও ভুল রয়েছে। এই যদি মহিলাদের সঙ্গে ব্যবহারের নমুনা হয়, ঈশ্বর রক্ষা করুন।’

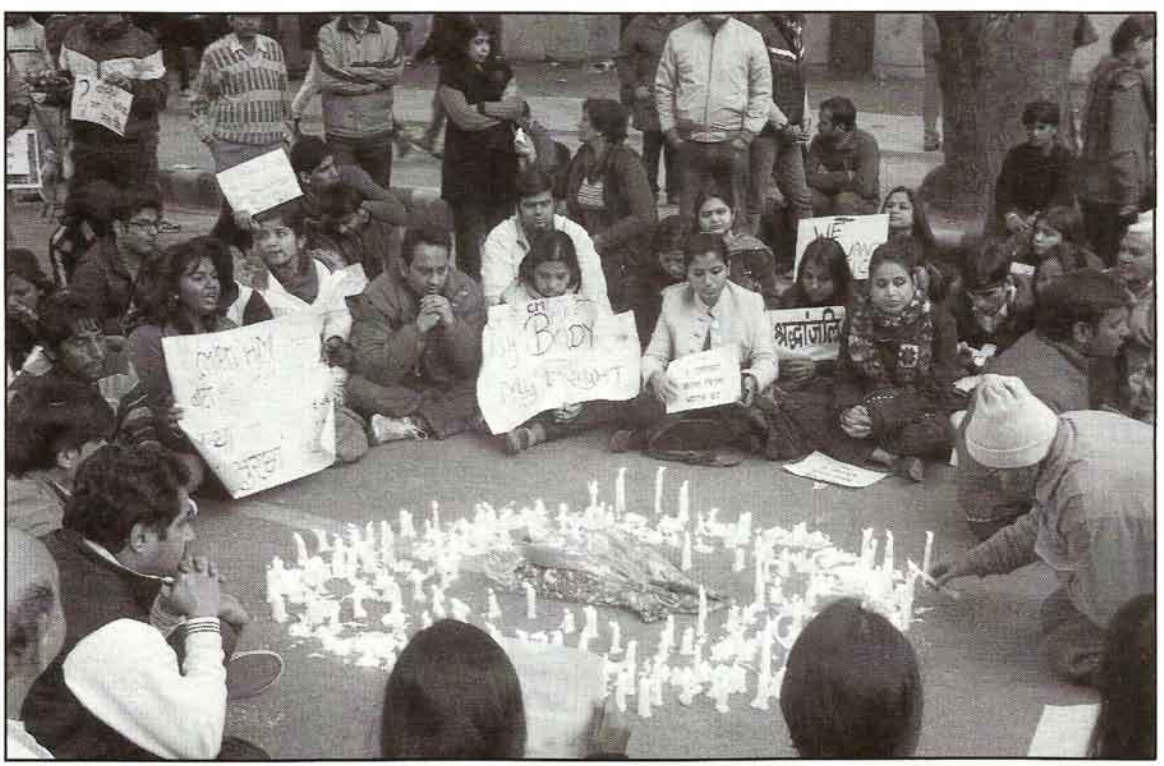

আহমেদাবাদে প্রতিবাদ

ক্ষোভে ফেটে পড়েন হাজার হাজার মানুষ।

● হুগলির শ্রীরামপুরে শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্রছাত্রী, সামাজিক সংগঠন থেকে শুরু করে আমজনতা, হাজার হাজার মানুষের প্রতিবাদী মিছিল বের হয়।

● শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীতে বিনয় ভবনের পড়ুয়ারা মোমবাতি মিছিল করেন।

● বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর সংস্কৃতি ও পর্যটন উৎসবের শুরুতে এদিন মোমবাতি জ্বালিয়ে নীরবতা পালন করা হয়।

● বর্ধমানের রানিগঞ্জ বইমেলায় এদিনের সব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বাতিল করে দেওয়া হয়।

● হুগলির চুঁচুড়ায় বিক্ষোভ দেখান মহিলারা। এদিন সন্ধ্যায় চুঁচুড়ার খাদিনা মোড় থেকে মিছিল করে স্কুল পড়ুয়ারা।

● বহরমপুরে কয়েক হাজার মানুষের একটি মিছিল বেরোয় এদিন।

● কৃষ্ণনগরে একটি মৌন মিছিল বের হয়, আর তাতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সামিল হন কয়েকশো মানুষ।

● শিলিগুড়ি থেকে পুরুলিয়া, আলিপুরদুয়ার থেকে রানিগঞ্জ, এ রাজ্যের সর্বত্রই সেদিন মানুষ শ্রদ্ধায়-শোকে-যন্ত্রণায় স্মরণ করতে চেয়েছে তাদের দামিনীকে। আর নীরব

আনন্দ মাহিন্দ্র,
শিল্পোদ্যোগী

‘ক্ষোভের আগুন জ্বলেছে, প্রশাসনের ওপর নিরন্তর চাপ রেখে যেতে হবে গণমাধ্যম ও সোশ্যাল মিডিয়াকে।’

প্রতিবাদের ভাষায় বারবার দাবি করেছে ধর্ষণকারীদের কঠিনতম দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি।

দিল্লি এবং কলকাতার পাশাপাশি সারা দেশ জুড়েই এদিন প্রতিবাদে সামিল হন অসংখ্য মানুষ।

● কোচিতে কালো কাপড়ে মুখ ঢেকে মহিলারা মৌন মিছিল করলেন।

রাহুল বোস,
অভিনেতা

‘মহিলাদের ওপর নির্মম অত্যাচারের নাগরিক অভ্যাসের প্রতিফলন দিল্লির গণধর্ষণের ঘটনা।’

● বেঙ্গালুরুর পথে স্কুল-কলেজ পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীরা এবং আমজনতা মোমবাতি মিছিলে সামিল হল। তাদের হাতে প্ল্যাকার্ড, তাতে লেখা : CAPITAL PUNISHMENT FOR ALL RAPISTS...।

● জালিয়ানওয়ালাবাগে ওইদিন সমবেত হন বহু মানুষ। মশালের সামনে জ্বলন্ত মোমবাতি হাতে নীরব জনতা।

● মোমবাতি আর পোস্টার হাতে নিয়ে নিঃশব্দ মিছিলে সেদিন সামিল হন গুয়াহাটির বাসিন্দারাও। তাদের হাতের পোস্টারে লেখা মাত্র কয়েকটি শব্দ যেন বুলেটের মতো এসে বিঁধেছিল একুশ শতকের আধুনিক সভ্য সমাজের বুকে। 'WE ARE ASHAMED–SAVE OUR GIRLS...'

● সারি সারি মোমবাতির আলোর মালা দিয়ে সাজিয়ে লেখা, 'DAMINI, WE ARE ALL WITH YOU...' পার্কে, বড় রাস্তার ধারে, পাড়ায় পাড়ায় একই দৃশ্য রচনা করলেন ২৯ ডিসেম্বরের সারাটা দিন ধরে, ভোপালের বাসিন্দারা। সেই আলোর মালাকে গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়িয়ে নতমস্তকে-নীরবে শপথ নিলেন অসংখ্য মানুষ। যেন তাঁদের ঘরের মেয়ে দামিনীকে বলতে চাইলেন, 'আমরা তোমার

করিনা কাপুর,
অভিনেত্রী

'মেয়েদের রাতে বেরোনো উচিত নয় বলে ফরমান দিলে সমস্যার সমাধান হয় না। একজন আধুনিক মহিলা হিসেবে আমি এই বক্তব্যকে সমর্থন করি না। রাতভর পার্টি করার অধিকার আমার আছে।'

পাশে আছি, তোমার ফেলে রেখে যাওয়া লড়াই আমরা সম্পূর্ণ করব। আমরা ভুলব না—ভুলে যেতে দেব না এ লজ্জাকে, অপরাধীদের প্রাপ্য শাস্তি আমরা দেবই।

● লখনৌ-এ গান্ধিমূর্তির পাদদেশে জমায়েত অগণিত মানুষ। দামিনীর অসম সাহসকে সাক্ষী রেখে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিল তারা তাদের আর্জি। আর্জি জানাল মেয়েদের সসম্মানে বেঁচে থাকার অধিকারের—আর্জি জানাল নারীত্বের মর্যাদা রক্ষার। প্ল্যাকার্ডে-পোস্টারে

প্রীতীশ নন্দী,
সাংবাদিক

‘স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিন্দেকে প্রস্তাব, সরকার সর্বত্র হোর্ডিং দিক, ‘ধর্ষণ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।’’

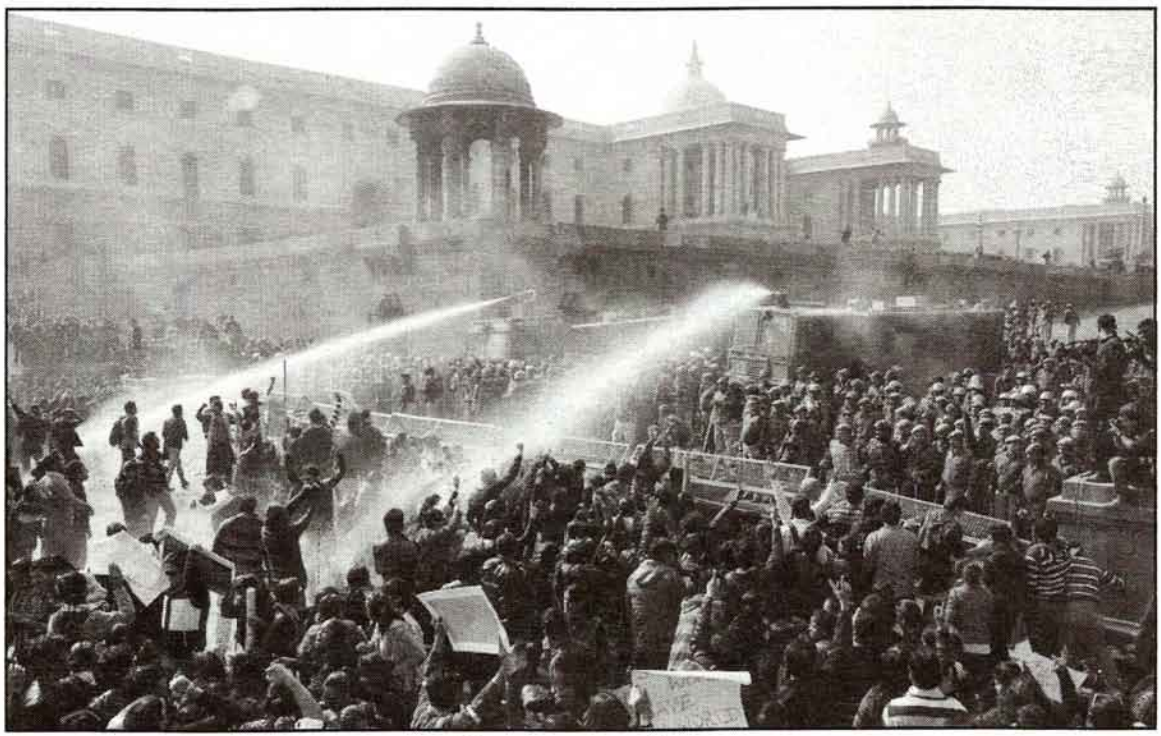

দিল্লিতে জনতার প্রতিবাদ

গান্ধিমূর্তির পাদদেশ জুড়ে বড় বড় হরফে লিখে দিল মানুষ SAVE WOMEN (NOW)...

● আহমেদাবাদে ছোট ছোট নিষ্পাপ শিশুরা পথে বেরোল সেদিন তাদের বড় প্রিয়—'নির্ভয় হৃদয় সাহসী দিদি' দামিনীর জন্য। মৌন মিছিলে পবিত্র প্রার্থনায় তার আত্মার শান্তি কামনা করল তারা, শ্রদ্ধা জানাল বড় নিঃশব্দ আদরে। অপরাধীদের শাস্তির দাবিতে তাদের ছোট্ট ছোট্ট হাতে ধরা ছোট্ট ছোট্ট প্ল্যাকার্ড। তাতে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা : 'CRIMINALS SHOULD BE PUNISHED...' কিংবা কোনও প্ল্যাকার্ডে লেখা 'RAPID ACTION, PROSECUTION AND EXECUTION..."

শোকাহত দামিনীর জন্মভিটেও। উত্তরপ্রদেশের বালিয়ার মান্ডওয়ারা কালান গ্রামে ২৯ তারিখ সকাল থেকেই গভীর বেদনার ছায়া। গ্রামের মানুষ সবাই একসঙ্গে হাতে হাত রেখে সেদিন চোখের জলে শপথ নিয়েছে, প্রতিটি নারীর সম্মান তারা দেহের শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও রক্ষা করবে, চিরকাল। তাদের বড় আদরের, বড় প্রিয়, বড় যত্নের মেয়েটি নিজের জীবন দিয়ে যে শিক্ষা দিয়ে গেল দেশকে, বিশ্বকে, তাকে তারা রক্তের অক্ষরে বুকের গভীরে সযত্নে

সুষমা স্বরাজ,

লোকসভার বিরোধী দলনেত্রী

"ওঁর মৃত্যুতে যন্ত্রণা ব্যক্ত করার পাশাপশি বলব, ভারতবাসীর চেতনা উন্মেষের এটাই আসল সময়। তা থেকেই গড়ে উঠবে এক নতুন ভারতবর্ষ। যেখানে আমাদের মেয়েরা নিরাপদ থাকবে।"

লালন করবে সারাজীবন।

দামিনীর চলে যাওয়া দেশের প্রতিটি মানুষের বুকে গভীর বেদনার মতো বেজেছে। দেশের প্রতিটি মাতৃহৃদয় তার মধ্যে খুঁজে পেয়েছে নিজের কন্যাটিকে এবং এক অনাগত আশঙ্কায় শিহরিত হয়েছে।

● নিজের ব্লগে ভ্যালারিন স্যান্টোস নামে জনৈক বৃদ্ধ লিখলেন—২০১১-তে বান্ধবীদের শ্লীলতাহানির হাত থেকে

নরেন্দ্র মোদি,
গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী

‘ভারতের এক নির্ভীক মেয়ের মৃত্যু হল। আমার গভীর সমবেদনা রইল ওঁর বাবা, মা এবং পরিবার-পরিজনের জন্য।’

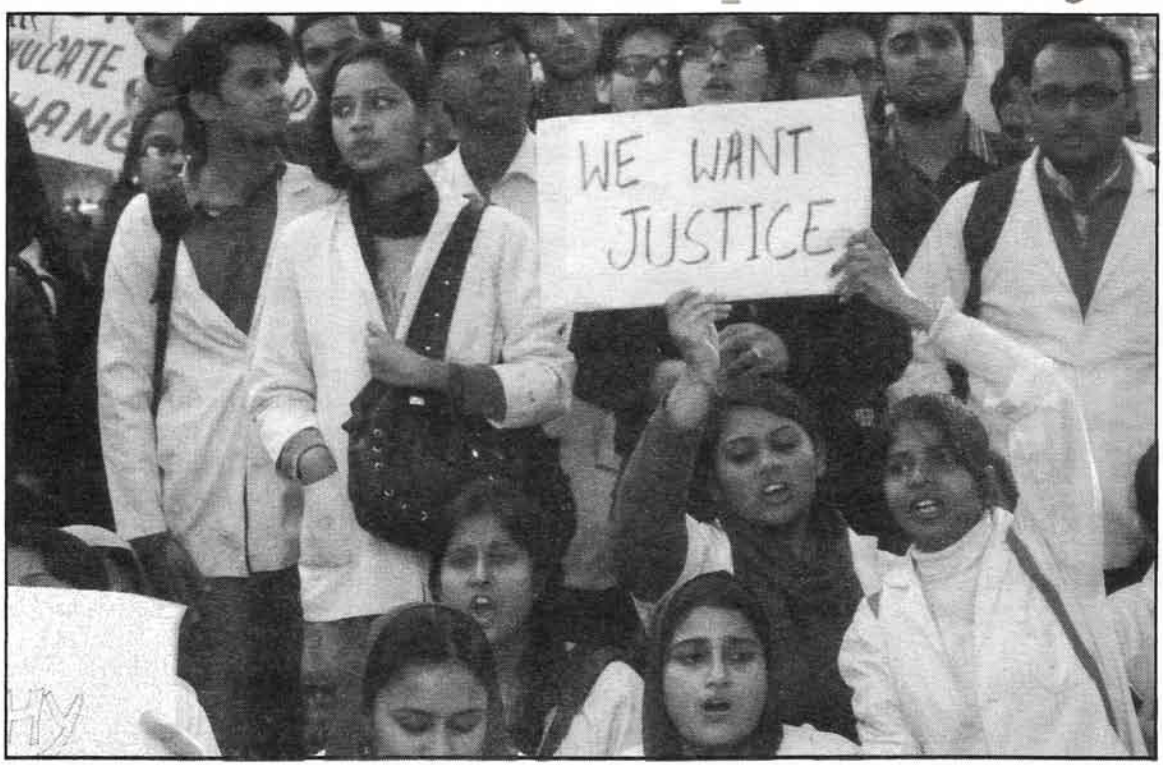

কলকাতায় জনতার প্রতিবাদ

বাঁচাতে গিয়ে দুষ্কৃতিদের হাতে মৃত্যু হয় তাঁর ছেলে কিনান স্যান্টোস-এর। নিজের ছেলের মৃত্যুতেও এতটা শোক পাননি তিনি, যতটা পেয়েছেন সাহসিনী দামিনীর মৃত্যুতে। ভ্যালারিন লিখেছেন, 'মেয়েটির মৃত্যুর খবর পেয়ে খুবই ভেঙে পড়েছি। গতবছর নিজের ছেলেকে হারিয়েও এত শোক, এত যন্ত্রণা আমি পাইনি। মেয়েটির পরিবারের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা রইল। প্রিয়জন হারানোর ব্যথা আমার চেয়ে ভালো আর কেউ বোঝে না। একবছর হয়ে গেল, আমার ছেলে নেই। সেই দুঃখ বয়ে বেড়ানো কী কঠিন, আমি জানি—আমি বুঝি। সর্বশক্তিমানের কাছে প্রার্থনা করব, যেখানেই ও গিয়ে থাকুক, ও যেন ভালো থাকে।'

জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন মমতা শর্মা দামিনীকে শহিদের আখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'মেয়েদের নিরাপত্তার অভাবে প্রাণ দিতে হল ওই তরুণীকে। শেষ হয়ে গেল একটি অধ্যায়। যে অধ্যায়ে নীচু হয়ে গেল দেশের মাথা। যে অধ্যায়ে যুক্ত হয়ে গেল লজ্জা-কলঙ্ক আর ধিক্কার! তবুও দেশের হাজার হাজার মানুষের সমবেত প্রার্থনা, পাশে থাকার অঙ্গীকার—মরণের পরেও জিতিয়ে দিল মেয়েটিকে। আসমুদ্র হিমাচলের সমস্ত মানুষের মতো আমিও গর্বিত ওর

লতা মঙ্গেশকর,
সঙ্গীতশিল্পী

'যথেষ্ট হয়েছে। নির্ভয়া দামিনীর মৃত্যু নয়, এটা আমাদের দেশের মানবিকতার মৃত্যু। সরকারের উচিত অবিলম্বে দোষীদের কঠোর শাস্তি দেওয়া।'

জন্যে। ও যেন সত্যিকারের শহিদ। আইনে অপরাধীরা যাতে সর্বোচ্চ সাজা পায় তার জন্যে আমরা সবাই ওর পাশে থাকব, লড়াই করব প্রতিদিন, প্রতিটি মুহূর্তে। যৌন নিগ্রহ সংক্রান্ত আইন সংশোধনে নাগরিক সমাজ আর সরকারকে একসঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করতে হবে। দেশ জুড়ে আমরা সবাই মেয়েটির পাশে, ওর পরিবারের পাশে আছি। বিশ্বের দরবারে এ লড়াই আমরা ছড়িয়ে দেব।

ওমর আবদুল্লা,
কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী

‘এক সাহসিনীর লড়াই থমকে গেল শান্তির স্বর্গরাজ্যে।’

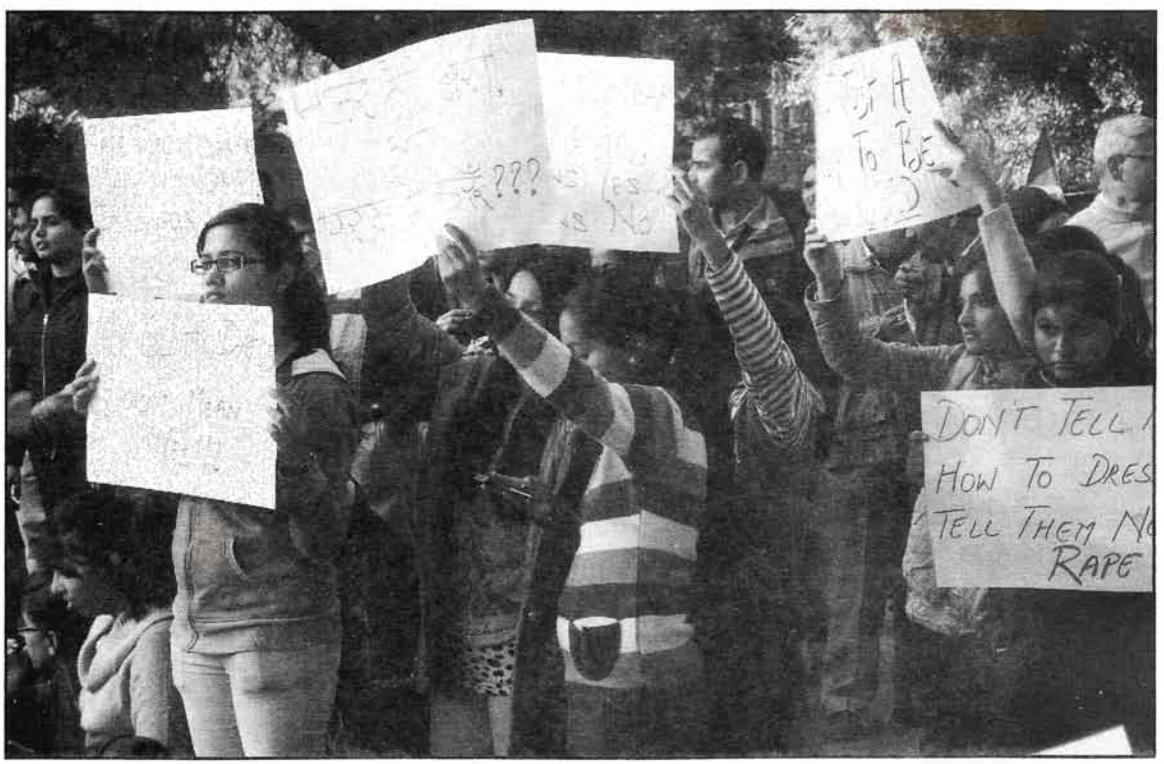

গুয়াহাটিতে প্রতিবাদে মুখর জনতা

আমরা সবসময় মনে রাখব—সত্যমেব জয়তে।'

২৯ ডিসেম্বর সকাল থেকেই রাজধানীর মানুষ শান্তি মিছিলের পাশাপাশি বিক্ষোভে সামিল হন। বিক্ষোভ যাতে ভয়াবহ আকার ধারণ না করে, সেজন্য শহরের সর্বত্র ওইদিন ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। বন্ধ করে দেওয়া হয় ১০টি মেট্রো স্টেশন। আটকে দেওয়া হয় ইন্ডিয়া গেট থেকে রাইসিনা হিলসের পথ। শেষ পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী শীলা দীক্ষিতের নির্দেশে যন্তর-মন্তর ও রামলীলা ময়দান মেট্রো স্টেশন খুলে দেওয়া হয়। সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্য সেদিন সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন ৭ নম্বর রেসকোর্স রোডে বৈঠকে বসেন কংগ্রেস নেতৃত্ব। সেই বৈঠকে সনিয়া গান্ধি উপস্থিত ছিলেন। মহারাষ্ট্র সফর কাটছাঁট করে দ্রুত ফিরে এসে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুশীল কুমার শিন্দেও যোগ দেন বৈঠকে।

১৬ই ডিসেম্বর রাতের ওই ঘৃণ্য ঘটনায় অভিযুক্ত ৬ জনের বিরুদ্ধে গণধর্ষণ, প্রমাণলোপ, ডাকাতির পাশাপাশি ভারতীয় দন্ডবিধির ৩০২ ধারায় খুনের মামলাও দায়ের করা হয়। দিল্লি পুলিশের স্পেশাল কমিশনার (আইন-শৃঙ্খলা) ধর্মেন্দ্র কুমার জানান, এই আইনের সর্বোচ্চ শাস্তিই অপরাধীরা পাবে।

বিবেক ওবেরয়,
অভিনেতা

‘এই ঘটনাই সমাজের কাছে জাগরণের বার্তা হয়ে উঠুক। সমাজে সত্যিকারের পরিবর্তন আনতে আর কত মেয়েকে এইভাবে অকালে মরতে হবে?’

২৯ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুশীল কুমার শিন্দে জানান, প্রথম থেকেই কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছিল— ওই তরুণীর চিকিৎসার ব্যয়ভার সরকারের পক্ষ থেকেই বহন করা হবে। সেই মতোই তার সমস্ত চিকিৎসা সংক্রান্ত খরচের দায় নিয়েছে ভারত সরকার, এবং সেই সঙ্গে তার শেষকৃত্যের সমস্ত খরচও সরকারেরই দায়িত্ব।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন, 'ওই নিষ্পাপ পবিত্র মেয়েটির

অমিতাভ বচ্চন, অভিনেতা

'দামিনী' আজ কেবলই একটি নাম। তরুণী চলে গেল। হৃদয়ে থেকে গেল এই নাম। শোক ভোলার নয়।

বেঙ্গালুরুতে জনতার প্রতিবাদ

এ আর রহমান,

সুরকার

‘মানবতার এত বড় অপমান, এটা সত্যিই কয়ামতের দিন। এখনই ব্যবস্থা নেওয়া না হলে সেটা জাতির লজ্জা।’

সঙ্গে যা ঘটল তা অত্যন্ত জঘন্য ও নারকীয়, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তা নিন্দারও অযোগ্য। তাই, ওই ধর্ষণের ঘটনায় ধৃত ৬ জন নরপিশাচের ছবি-নাম-ঠিকানা বড় বড় পোস্টারের আকারে দিল্লির নানা জায়গায় টাঙিয়ে দেওয়া হবে। যাতে সবাই এই ঘৃণ্য মানুষদের সহজেই চিনে নিতে পারে।’

একই সঙ্গে রাজধানী জুড়ে ২৯ ডিসেম্বর সকাল

প্রতিবাদ চন্ডিগড়ে

থেকেই নারী অধিকার ও নারী সুরক্ষা বিষয়ে একটি বিশেষ প্রকল্প অভিযান শুরু হয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিশেষভাবে অনুরোধ করেন, সবাই যেন শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে এই অভিযানে সামিল হন।

সেদিনই হাতে হাত রেখে মানব শৃঙ্খল তৈরি হল সারা দেশ জুড়ে।

আইন অনুযায়ী শাস্তি হবে দোষীদের। কিন্তু সর্বোচ্চ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে, দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত আইনের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাবার সংবেদনশীল আকাঙ্খায় বিক্ষোভে গর্জন করে উঠলেন সারা দেশের মানুষ। সাতের দশকে মহারাষ্ট্রের 'মথুরা ধর্ষণ মামলার' জেরে এদেশের ধর্ষণ বিরোধী আইন ঢেলে সাজানো হয়েছিল। মানুষের আশা, এবারেও সেই ভাবেই ঢেলে সাজানো হবে এবং আরও কঠোরতর হবে আইন। ধর্ষকদের জন্য থাকবে চরমতম শাস্তির ব্যবস্থা। বর্মা কমিশন অবশ্য তার সুপারিশে মৃত্যুদণ্ড রাখেনি। সর্বোচ্চ শাস্তি হিসেবে বলা হয়েছে আজীবন কারাদন্ডের কথা।

জাতির বিবেককে নাড়িয়ে দিয়ে চলে গেল দামিনী। সিঙ্গাপুরের মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালের চিকিৎসকেরা তাকে মৃত ঘোষণার পরই, দেহ হাসপাতাল থেকে বের

জাভেদ আখতার,
কবি

'আমরা ওকে দেখিনি,
নামও জানি না। হয়তো
সেই কারণেই ও
আমাদের ঘরের মেয়ে
হয়ে উঠেছিল।
সব মেয়ের মুখেই
ওর মুখ ভাসছিল।'

অনুপম খের,
অভিনেতা

‘মেট্রো বা ইন্ডিয়া গেট বন্ধ করে রাখার সময় এটা নয়। ক্ষমা চাওয়ার সময়। মানুষের ন্যূনতম প্রত্যাশা পূরণ করতে না পারার জন্য ক্ষমা।’

করে আনা হয়। বিশেষ একটি পুলিশ ভ্যানে নিয়ে যাওয়া হয় মর্গে। ময়না তদন্তের পর মরদেহ তুলে দেওয়া হয় স্থানীয় হিন্দু সৎকার সমিতির হাতে। ভারত সরকারের তরফে দ্রুত পাঠিয়ে দেওয়া হয় এয়ার ইন্ডিয়ার এয়ারবাস এ-৩১৯। সঙ্গে যান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কয়েকজন প্রতিনিধি। শনিবার শেষ রাতেই ওই বিশেষ বিমানে তার মৃতদেহ ভারতে ফিরিয়ে আনা হয়। বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী ও সোনিয়া গান্ধি।

এরপরই শুরু হয় খুনের মামলা। সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী দয়ান কৃষ্ণণকে এই মামলার বিশেষ কৌঁসুলি নিয়োগ করে দিল্লি পুলিশ। সম্পূর্ণ বিনা পারিশ্রমিকে এই মামলার দায়িত্ব গ্রহণ করেন তিনি।

কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধি দেশবাসীকে বার্তা দিলেন, 'একজন মহিলা ও মা হিসাবে দেশবাসীর অনুভূতি আমি উপলব্ধি করতে পারছি। আপনাদের সকলের কাছে আমার আবেদন, আপনারা শান্ত থাকুন, আসুন আমরা সকলে মিলে লড়াই করার শক্তি সঞ্চয় করি।'

রাহুল গান্ধি বললেন, 'জাতি হিসাবে আমাদের উচিত সামনের দিকে তাকানো। মহিলাদের নিরাপত্তা ও মর্যাদা রক্ষার জন্য আমাদের অবশ্যই সচেষ্ট হতে হবে।'

শাবানা আজমি,
অভিনেত্রী

'আমাদেরই অক্ষমতা আমাদের চোখে চোখে রাখছে। ভাবা দরকার, ঠিক কী কী ভাবে তৈরি হয় সমাজের মন, যা নারীকে সম্পত্তি ভাবতে শেখায়।'

সাত

৩০ ডিসেম্বর, রবিবার ভোরে দামিনীর দেহ নিয়ে যাওয়া হয় দিল্লির মহাবীর এনক্লেভের বাড়িতে। হাসপাতালের বেডে শুয়ে স্বপ্নে-জাগরণে যেখানে সে ফিরে যেতে চেয়েছিল আবার তার ফেলে যাওয়া স্বপ্নগুলোকে ছুঁয়ে দেখার জন্য। শেষপর্যন্ত সেখানেই ফিরে গেল, প্রাণহীন-নিঃসাড়-শবদেহ হয়ে। শবদেহ কি স্বপ্ন দেখতে পারে!...

সেখানে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সেরে আনা হয় দ্বারকার সেক্টর ২৪-এর একটি শ্মশানে। সেখানে সকাল সাড়ে ছ'টায় রাষ্ট্র মর্যাদায় তার অন্ত্যেষ্টি সম্পন্ন হল। মুখাগ্নি করলেন হতভাগ্য পিতা বদ্রি সিং পান্ডে। ওই দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে মা আশা দেবী মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। ভারতকন্যার

মেরি কম,
অলিম্পিয়ান

"আজকের আধুনিক শহরে এমন ঘটনা, ভাবা যায় না। মেয়ে হিসেবে ওর যন্ত্রণা অনুভব করতে পারছি।"

শেষকৃত্য দেশের মানুষ দেখতে পায়নি। সম্পূর্ণ মানবিক কারণে 'ব্রডকাস্ট এডিটরস অ্যাসোসিয়েশন' আগে থেকেই মরমী আর্জি রেখেছিলেন দেশের সমস্ত সংবাদ মাধ্যমের কাছে—শেষকৃত্য সংক্রান্ত কোনও অনুষ্ঠান যেন সম্প্রচার না করেন তাঁরা। সেই নির্দেশ মেনে কোনও সংবাদ-মাধ্যমই সরাসরি সম্প্রচার করেনি সেই শেষকৃত্য। সযত্নে গোপন

নীরজ কুমার,
দিল্লির পুলিশ কমিশনার

‘ধর্ষকদের মৃত্যুদণ্ডের জন্য আইন প্রণয়নে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে প্রস্তাব জানাব।’

রেখেছে সেই অম্লান স্মৃতিকে হৃদয়ের গহীন-গভীরে।

সোমবার ওই সময় দ্বারকার আকাশ ঢেকে ছিল ঘন কুয়াশায়। ১৬ ডিসেম্বর রাতে যেমন আচ্ছন্ন হয়েছিল সমাজের শুভবোধগুলো। দামিনীর চিতার আগুনে যেন ছিন্ন হল সে কুয়াশার কু-আশাচ্ছন্ন অন্ধকার। জন্ম নিল নতুন শপথ, নতুন প্রতিবাদের ভাষা, নতুন প্রতিজ্ঞা। জ্বলন্ত চিতা থেকে উঠে এল যেন মানব প্রাণের অন্তর্নিহিত বার্তা:

আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে,
এ জীবন পুণ্য কর দহন দানে...'

সেদিনই বাবা বদ্রি সিং পান্ডে মেয়ের চিতাভস্ম নিয়ে ফিরে যান উত্তরপ্রদেশের মান্ডওয়ারা কালানে। সঙ্গে ছিলেন মা আশা সিং পাণ্ডে এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যেরা।

মঙ্গলবার, ১ জানুয়ারি, ২০১৩। নতুন বছরের প্রথম ভোরে গ্রাম থেকে ৮ কিলোমিটার দূরে ভরৌলি ঘাটে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিলেন বদ্রি সিং, বড় আদরের মেয়ের চিতাভস্ম।

বিসর্জন দিলেন তাঁর অনেক স্বপ্ন-সাধ আর বুকভরা অনেক আশা। গঙ্গার বুক থেকে উঠে আকাশের দিকে তাকিয়ে একবার ডুকরে কেঁদে উঠলেন। পৃথিবীর বুক থেকে

শাহরুখ খান,
অভিনেতা

'আমার যন্ত্রণা হচ্ছে ভেবে, আমি এমন একটা সমাজ ও সংস্কৃতির অংশ। আমার যন্ত্রণা হচ্ছে যে, আমি একজন পুরুষ। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আমার প্রতিবাদের কণ্ঠ হবে তুমিই। আমি নারীকে সম্মান করব, যাতে বাবা হিসেবে মেয়ের শ্রদ্ধা অর্জন করতে পারি।'

হারিয়ে গেল দামিনী...স্রোতের টানে তখনও ভেসে যাচ্ছে দামিনীর ভস্ম কলস আর কিছু জড়ো হওয়া ফুলের মালা.....ভাসতে ভাসতে মিলিয়ে যাচ্ছে দূর থেকে... আরো দূরে.....

মহেশ ভট্ট,
পরিচালক

‘নারীমূর্তির পুজো হয় যে সব মন্দিরে, সব বন্ধ করে দাও। কাঁদো ভারত! নিজের মেয়ের রক্ত লেগে রয়েছে তোমার হাতে। মেয়েরা মুখ খোলো।’

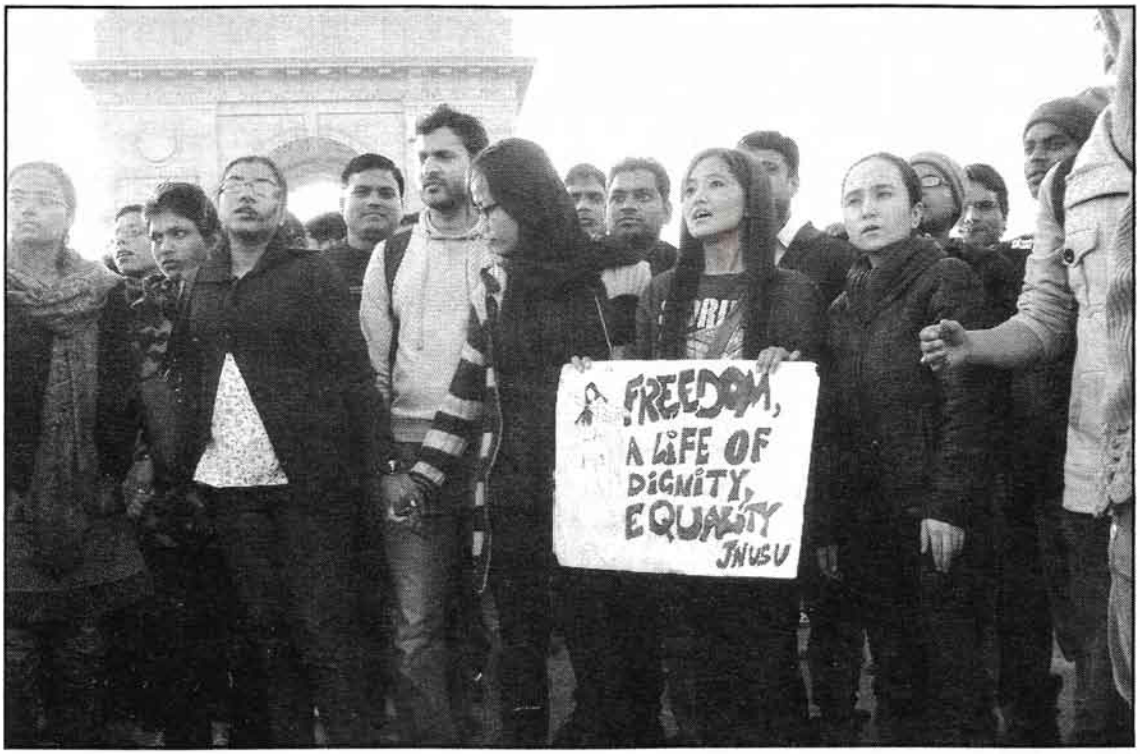

দিল্লিতে মানুষের প্রতিবাদ

আট

১৬ ডিসেম্বরের সেই কলঙ্কিত রাতে, যখন রাজধানীর রাজপথে চলন্ত বাসের মধ্যে মেয়েটির উপর প্রায় ৪০ মিনিট ধরে জঘন্য নারকীয় অত্যাচার চালাচ্ছিল বর্বর দুষ্কৃতিরা, ঠিক সেই সময় কাল্পনিক চোখে দেখে নেওয়া যেতে পারে রাজধানীর অন্যত্র, দেশের অন্যান্য অংশে নিশ্চিন্ত-নিরুপদ্রব-সুখী কিছু চিত্র। যে সময়ে মেয়েটি নির্যাতনের যন্ত্রণায় ধ্বস্ত হতে হতে পৃথিবীকে আর্তনাদ করে বলছে—'আমি বাঁচতে চাই, আমাকে বাঁচতে দাও'—

● ঠিক সেই সময় হয়ত শহরের কোনও নিরাপদ ফ্ল্যাটে আপাতসুখী কোনও নবদম্পতি পারস্পরিক কূজনে মগ্ন।

● কোনও নিস্তরঙ্গ পরিবারের কর্ত্রী হয়ত তখন ডিনার-টেবিলে রাতের খাবার সাজাতে ব্যস্ত...

● কোনও রাতের লোকাল ট্রেনে হয়ত তখন সারাদিনের

সলমন খান,

অভিনেতা

‘এ রকম কোনও ঘটনার কথা শুনলে প্রথমেই মনে হয় অপরাধীদের মৃত্যুদণ্ড হওয়া উচিত।...মৃত্যুদণ্ড যদি না হয়, সে ক্ষেত্রে দোষীদের শিক্ষা দিতে অন্তত যাবজ্জীবন কারাদণ্ড তো হওয়াই উচিত।’

ক্লান্তি শেষে বাড়ি ফিরছে কোনও ক্লান্ত যুবক। দিনের শেষে পৃথিবীর কোনও খবরে তার আর কোনও আগ্রহ নেই...

● কোনও ব্যস্ত এক্সিকিউটিভ পরের দিন অতি ভোরে জরুরি অফিস ট্যুরে দেশের বাইরে যেতে হবে বলে, হয়ত সাত তাড়াতাড়ি রাতের খাওয়া সেরে কম্বলের উষ্ণ-অধিকারে নিজেকে সঁপে দিয়ে সুখ-নিদ্রায় মগ্ন। বেডরুমে তার সবুজ রাতবাতির নিশ্ছিদ্র সুখ।

● কোনও ধনী ব্যবসায়ী নিজের শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ইম্পোর্টেড গাড়িতে বাড়ি ফিরতে ফিরতে কোলের ওপর রাখা ল্যাপটপে সাজিয়ে নিচ্ছেন আগামী কর্মছক, দেখে নিচ্ছেন পরবর্তী দিনের ওয়ার্ক সিডিউল...

● কোনও রাতমদির ডিস্কোথেকে একঝাঁক তরুণ-তরুণী হয়ত তখন মিউজিকের তালে তালে পা মিলিয়ে সুখী যৌবনের স্বপ্নে বিভোর...

● পাড়ার কোনও চায়ের দোকানে হয়ত তখন সন্ধ্যে পার করা রাতের আড্ডায় শেষ ভাঁড় চা হাতে নিয়ে বাড়ি ফেরার আগে লাস্ট-মিনিট তর্কে-বিতর্কে মশগুল কিছু মানুষ।

● পাড়ার কোনও ক্লাবঘরে ক্যারাম কম্পিটিশন হয়ত তখন তুঙ্গে উঠেছে...

অথচ কেউ ঘুণাক্ষরেও জানতে পারল না, ঠিক সেই মুহূর্তেই দেশের অন্য এক প্রান্তে চলন্ত বাসের মধ্যে ঘটে চলেছে সেই ভয়াবহ-নৃশংস ঘটনা। ছিঁড়ে-খুঁড়ে বে-আব্রু হয়ে যাচ্ছে নারীর লজ্জা-নারীর সম্মান। একবারের জন্যেও কান পেতে কেউ শুনতে পেল না রাজধানীর নাগরিক

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়,
ক্রিকেটার

‘যারা কাজটা করেছে, জানি না তারা মানুষ কিনা। ওদের কঠোরতম শাস্তি হওয়া উচিত।’

রাতের অন্ধকারকে ফালা ফালা করে দেওয়া একটা অসহায় মেয়ের বুকফাটা আর্তনাদ—'আমি বাঁচতে চাই...আমাকে বাঁচতে দাও।'

আমি নিজে কী করছিলাম সেই সময়ে? শহর কলকাতার বুকে আপাত নিরাপদ নিশ্চিন্ত সুখে হয়তো তখন আমার ব্যক্তিগত সময় কেটে যাচ্ছিল মসৃণ ছন্দে।

পরবর্তী সময়ে এই লেখা লিখতে বসে যতবার সেই সময়টার কথা কল্পনা করেছি মনে মনে, ততবারই দু-চোখের কোল ভিজে উঠেছে।

বারেবারেই কলম থেমে গেছে। চোখের জল উপেক্ষা করে তবুও লিখেছি। আর মনে মনে শপথ নিয়েছি, আমার এই লেখার মধ্যে দিয়ে আমি শ্রদ্ধা জানাব তার দৃপ্ত সাহসকে, শ্রদ্ধা জানাব তার অতৃপ্ত আত্মাকে। কোনও সংবাদপত্রের বা বৈদ্যুতিন সংবাদমাধ্যমের টুকরো টুকরো সীমিত পরিসরের সংবাদের আঙ্গিকে নয়, বিশদে জানাব তার কথা, তার জীবনপণ জেদ, আর লড়াইয়ের কথা—এদেশের মানুষের কাছে, বিশ্বের দরবারে।

যখন লিখছিলাম তখন আমারই চোখের সামনে ঘটে চলেছিলো আর এক ঘটনা। আমার স্ত্রী মৌ অদূরে টেবিলে বসে আচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যে লিখে চলেছে একটি কবিতা। তাকে দেখে বুঝতে পারছি, সে যেন নিজের মধ্যে নেই। তাকে গ্রাস করেছে দামিনী। দামিনী-চমকেই ঝলসে উঠেছে তার ভাষা। সে লিখে চলেছে—

অভিষেক বচ্চন,
অভিনেতা

‘ভারতীয় হিসেবে গর্ব ছিল। কিন্তু না, এই দেশে আমি বড় হইনি। চাই না, আমার মেয়ে বড় হয়ে এই দেশকে চিনুক।’

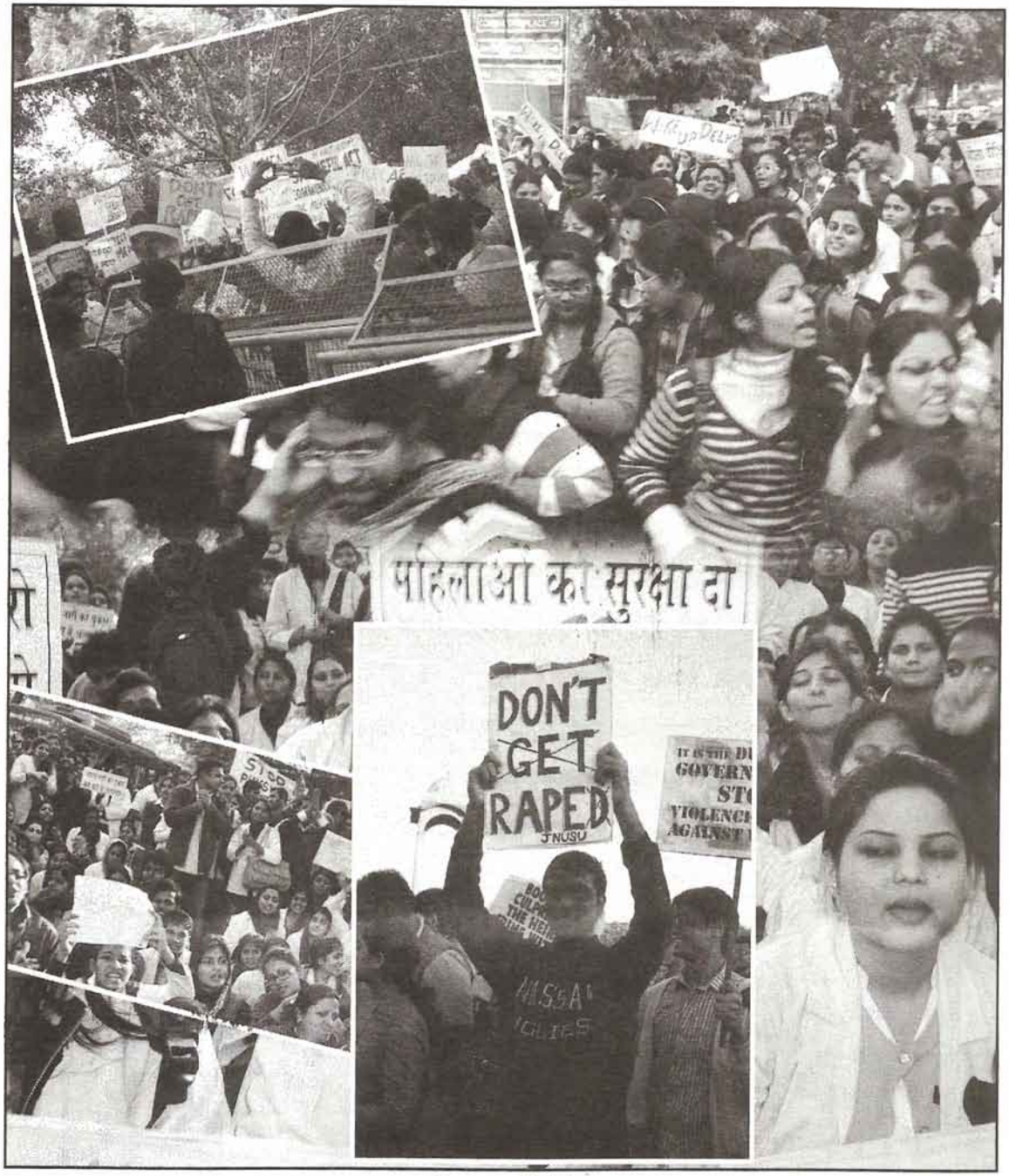

প্রতিবাদের মিশ্রচিত্র

আমি দামিনী

আমার চারপাশে দাউদাউ করে জ্বলছে
অসম্মান আগুনের শিখা—
সারা শরীর ঝলসে যাচ্ছে তীক্ষ্ণ ভর্ৎসনায়
অপমান-ঘৃণা ফোস্কা ফেলছে শরীরের কোণায়।
জীবন নামক যুদ্ধে আমার চূড়ান্ত হার,
পরাজিতর একমাত্র শাস্তি মৃত্যু, কিন্তু
আত্মহত্যার সামনে দাঁড়ানোর সাহস আমার সীমিত।
খুনি আসামীরও নিজের পক্ষে
যুক্তি দেওয়ার নিয়ম আছে,
আমি নারী—তাই সে অধিকার আমার নেই।
আমার রায় লেখা হয়ে গেছে
পুরুষ নামক দেবতার কাছে।
অন্যায় সহ্য করে যাওয়ার অসীম ক্ষমতায়
সমাজে আমি বাহবা পাই।
প্রতিবাদ আমায় মানায় না—
যুক্তি-বুদ্ধি-তর্ক, শব্দগুলো আমার কাছে দুর্বোধ্য।
পুরুষ দেবতার কথা মেনে চলাই
আমার একমাত্র ভবিতব্য।
আমি নারী—আমার পরিচয়
কখনও আমি পুরুষের কন্যা
কখনও বা ভগিনী, বান্ধবীও হতে পারি।

নামে পুরুষের সহধর্মিনী, তবে স্থান পদতলে,
একসময়, আমি মানুষের মা—
তবু নেই আমার কোনও নিজস্ব ঠিকানা
নেই কোনও অপরিবর্তিত পদবী।
খড়কুটোর মতো ভেসে চলে আমার জীবন
এক থেকে আর এক সংসারে।
মাতৃরূপে আমি অনন্যা
তবু পুরুষের চোখে, আমি নগণ্যা—
আমি বনলতা, রম্ভা-উর্বশী-শক্তিরূপিনী
বাস্তবে, আমি পুরুষের কাছে
ভালোবাসা-মায়া-মমতার উর্ধ্বে—
শুধুই তার শয্যাসঙ্গিনী।
কখনও আমি ধর্ষিতা, কখনও আমি জ্যোতি
পুরুষ পেলো সুখ, আমার শুধুই ক্ষতি।
ক্ষত-বিক্ষত শরীরে, তবু বাঁচার কী অদম্য ইচ্ছা—
আমি হসপিটালে, চিকিৎসার নামে চলে রাজনীতি
মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধে আমার সাহস দেখে,
আমায় নাম দেওয়া হয়,
আমানত-দামিনী-নির্ভয়া-জাগৃতি,
শেষে, মৃত্যুর কাছে আমি হেরে গেলাম,
তবু, মনের কোণে, কোথাও যেন আমার জয়ের
অহংকার
আমি নারী—আমিই হতে পারি গর্ভধারিণী

আমিই দেবী বিদ্যার, আমিই দেবী অর্থের
আমারই হাতে অশুভ শক্তির বিনাশ
অসুর বধে স্বর্গের দেবতাও করে আমার পূজা
আমিই দশভূজা...
কবির কাব্যে আমি কল্পনা,
শিল্পীর তুলিতে আমি যামিনী
তাই জীবনে আমি হার মানলেও
মৃত্যুর কাছে হারিনি
আমি নির্ভয়া, আমিই দামিনী—

মানুষের প্রতিবাদ দিল্লিতে

আমরা কেউ জানি না, আগামী দিন আমাদের জন্য কোন্ বার্তা বয়ে আনবে। আমরা জানি না, কয়েক মুহূর্ত পরের ভবিষ্যৎ আমাদের জন্য কোন আয়োজন সাজিয়ে রেখেছে! যেমন সেইদিন জানত না দামিনী। যদি জানা যেত, তাহলে হয়তো একুশ শতকের সভ্যসমাজের বুকে রক্তের অক্ষরে লেখা হত না তার দুর্ভাগ্যের ইতিবৃত্ত।

তবুও আমার এই লেখা লিখতে লিখতে, সেই অনিঃশেষ তারুণ্যকে স্মরণ করে মনে মনে বার বার বলেছি—'তুমি রবে নীরবে...হৃদয়ে মম...'।

বলেছি, 'তুমি ছিলে, তুমি আছ, তুমি থাকবে চিরকাল আমাদের অন্তরের পাশটিতে, আমাদের মনের মণিকোঠায়, আমাদের জাতীয় সাহসের নির্ভীক প্রতীক হয়ে। আমরা তোমাকে ভুলব না—তুমি আমাদের এই বিশাল ভারতবর্ষের নির্ভয়া।'

তারই জন্য দেশ জুড়ে পথে নেমেছে লক্ষ লক্ষ মানুষ, প্রতিটি মুহূর্তে তার খবর জানতে চেয়ে বার্তা পাঠিয়েছে সারা বিশ্ব, শুধু তারই জন্য বারবার দেশবাসীর কাছে শান্ত থাকার প্রার্থনা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী-রাষ্ট্রপতি সহ সমস্ত শীর্ষ নেতৃত্ব, শুধু তারই জন্য দিল্লি প্রশাসন নারীর নিরাপত্তার জন্য চালু করেছে দুটি ২৪ ঘণ্টার হেল্পলাইন। রাজধানীর প্রতিটি রাত যেন সমস্ত মেয়ের জন্য নিরাপদ রাত হয়, যেন গভীর রাতেও একলা পথচারী কোনও নারীকে ধর্ষিত হতে না হয়, অত্যাচারিত হতে না হয়।

অনুষ্কা শর্মা,
অভিনেত্রী

'আমার দেশ, আমার দেশবাসী আজ হতাশ করল। লজ্জা লাগছে, যা হচ্ছে। মানুষের জীবনের দাম এ দেশে এইটুকুই!'

অক্ষয় কুমার,

অভিনেতা

যেদিন মেয়েরা রাতে নিরাপদে রাস্তায় বেরোতে পারবে, সেদিনই ভারত সত্যিকারের স্বাধীন হবে। গণতন্ত্রের আত্মার জন্য শান্তি কামনা রইল!

সেদিন যে মুনিরকা বাসস্টপ থেকে দামিনী বাসে উঠেছিল, সেই বাসস্টপ থেকেই দিল্লির মানুষ প্রতিবাদে গর্জন করে উঠেছিল বারবার—

"হক কি দাবিদারি হ্যায় সারি রাত হামারি হ্যায়।"

না, কোনও রাজনৈতিক স্লোগান কিংবা ক্ষমতা দখলের আস্ফালন নয়, এ সবই হয়েছিল শুধু 'তারই' জন্য...

আর তাই তো লড়াকু মেয়েটির না-বলা কথাগুলোই যেন ধ্বনিত হল বিহ্বল জনতার সমবেত কণ্ঠে।

এই মেয়েটি ঘরে কী চাইত?

'আজাদি'

বাসে কী চাইত?

'আজাদি'

সর্বত্র?

'আজাদি'। 'আজাদি'।

'আজাদ' মেয়েটি যদি একবার শুনতে পেত!

শেখর কাপুর,

অভিনেতা

‘আমরা সব ভুলে যাব, সেটাই হবে বিশ্বাসঘাতকতা। রাজনীতিকরাও সেই ভরসায় আছেন। ভুলে না যাওয়াই একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত।’

প্রতিবাদ-পোস্টার

সারা দেশের হৃদয়কে আন্দোলিত করেছে ওই ২৩ বসন্তের তাজা প্রাণ। হাসপাতালের মৃত্যুশয্যায় শুয়ে সে প্রাণপণে চেয়েছে বেঁচে থাকতে। পারেনি সে, কিন্তু দেশকে দিয়ে গেছে এক অনন্ত সংগ্রামের শক্তি।

নতুন একটা ভোর - নতুন স্বপ্নের একটা দিন দেখতে চেয়েছিল সে। তার ওই নিভে যাওয়া চোখদুটো শত-সহস্র চোখের মাঝখানে জেগে থাকবে চিরকাল, লক্ষ চোখ দিয়ে সে যেন দেখবে আবার আগামী কালের কলুষমুক্ত পৃথিবীকে, শুভবোধের সমাজকে।

৩১ ডিসেম্বর বর্ষবরণের রাতের আনন্দ অনেক ফিকে হয়ে গেছিল শুধু তারই জন্য। অনুষ্ঠান-উৎসবকে দূরে সরিয়ে রেখে, শোকের ছায়ায় মগ্ন ছিল মানুষ।

রাত তখন প্রায় দুটো, দক্ষিণ কলকাতার হাজরা মোড়ে ছ'জন সত্তরোর্ধ্ব বৃদ্ধ পথে বেরোলেন, হাতে তাঁদের একটা কেকের বাক্স, আর একটা বড় পোস্টার—তাতে লেখা, 'দামিনী, তুমি আমাদের মেয়ে। তুমি যেখানেই থাকো, ভালো থেকো। তোমাকে আমরা ভুলব না।' রাস্তার একধারে ইট সাজিয়ে একটা বেদি তৈরি করলেন তাঁরা, তার ওপরে রাখলেন পোস্টারটি। সামনে জ্বালিয়ে দিলেন বড় বড় মোমবাতি, কিছু ফুলের স্তবক রাখলেন, তারপর একটা প্লেটে পরিপাটি করে কেক কেটে সাজিয়ে দিলেন, মোমবাতির সামনে। আহা, এবার নতুন বছরে মেয়েটার

অজয় দেবগণ,
অভিনেতা

"একটা বিপ্লব শুরু করতে কেন সব সময় কাউকে না কাউকে আত্মত্যাগ করতে হবে? তাঁর এই আত্মত্যাগ যেন বিফলে না যায়।"

কেক খাওয়া হল না যে...!!

আর ঠিক তার কিছু পরেই রাজধানী শহর দিল্লিতে, ঘড়িতে তখন রাত প্রায় আড়াইটে, মুনিরকা বাসস্ট্যান্ডে তখন অনির্বাণ জ্বলে রয়েছে মোমবাতির শিখা। মোমবাতি নিভছে না ওইখানে, নিভতে দিচ্ছে না দিল্লির মানুষ, মোমবাতি নিভু নিভু হয়ে এলেই পথচলতি কেউ না কেউ সেই মোমবাতি থেকে ধরিয়ে দিয়ে যাচ্ছে আরেকটি মোমবাতি। দু-একজন পুলিশ পাহারায় রয়েছে। পথচলতি গাড়ি থমকে দাঁড়াচ্ছে, অনেকেই নেমে আসছেন গাড়ি থেকে, শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন দামিনীর উদ্দেশে।

তেমনি করেই থেমে গেল একটি গাড়ি। গাড়ি থেকে বাবার হাত ধরে নেমে এল একটি কিশোরী, হাতে ফুলের তোড়া। একদৃষ্টে চেয়ে রইল অসংখ্য মোমবাতির শিখার দিকে। কান্নাভেজা চোখে ফুলের তোড়ার সঙ্গে মোমবাতির সামনে রাখল একটি ছোট্ট চিরকুট। সে চিরকুটে লেখা ছিল শুধু একটি ছোট্ট শব্দ—'সরি'।

এমনিভাবেই বেঁচে থাকবে মৃত্যুঞ্জয়ী দামিনী আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে। আমাদের মননে, আমাদের চিন্তায় আমাদের স্নেহে-ভালোবাসায় আর শ্রদ্ধায়।

একটি সাহসী সত্ত্বা তার নিজের জীবনকে অতিক্রম করে দিনে দিনে আমাদের কাছে যেন হয়ে উঠবে সত্যিকারের 'লার্জার দ্যান লাইফ'।

আজকের পৃথিবীর মানুষ হৃদয় নিংড়ানো সুরে আগামীর

বোমান ইরানি,
অভিনেতা

'ও ছিল বিপ্লবের সেনানীর মতো। যদি আমরা ওকে ভুলে যাই, ওই অভিযুক্তদের থেকেও বেশি অপরাধ করব।'

ঋতুপর্ণার কলমে

দামিনী এমন এক নাম, এমন তার তেজ, এমন তার স্পর্শ যে আমরা অভিভূত হই, লজ্জিত হই, পরাজিত হই, প্রজ্জ্বলিত হই। দামিনী আমাদের সংস্কার, আমাদের লজ্জা, আমাদের হতাশা! কিন্তু আমাদের ভেতরের ভয়কে জয় করা শিখিয়েছে ওই মহৎ আত্মা, যার ছবি সকালের রোদ্দুরের মতো সত্যি, সকালের বাসি নিঃশ্বাসের মতো সত্যি। দামিনী বলে ওঠে বারবার, 'আমি আছি। আমি আছি তোমাদের হৃদয়ের ওঠানামায়। আমি সেই চিরন্তন সত্য, যে গর্জেছিল। বর্ষণ হয়নি। বর্ষণ করবে তোমরা।' সত্যমদার দামিনী রোজ আমায় একটু-একটু করে জাগায়। একটু-একটু করে কাঁদায়। আমাকে কুরে-কুরে খায় নারীর নগ্ন সত্য। নারীশক্তির এক অনন্য উন্মোচন করেছে অসাধারণ এই বইটি।...দামিনী! তুমি আমাদের ঐশ্বর্য, তোমায় ভুলতে দেব না একমুহূর্ত।

---

* 'দামিনী'র প্রথম প্রকাশ অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত উপস্থিত ছিলেন। বইটি পড়ে স্বতঃস্ফূর্ত লিখে পাঠান তাঁর একান্ত উপলব্ধি।

নাগরিক সভ্যতাকে বলতে চাইবে বারবার—

তবু মনে রেখো—
যদি জল আসে আঁখি পাতে...
তবু মনে রেখো—
যদি পড়িয়া মনে—
ছল ছল জল নাই দেখা দেয়—নয়নকোণে,...
তবু মনে রেখো...।।

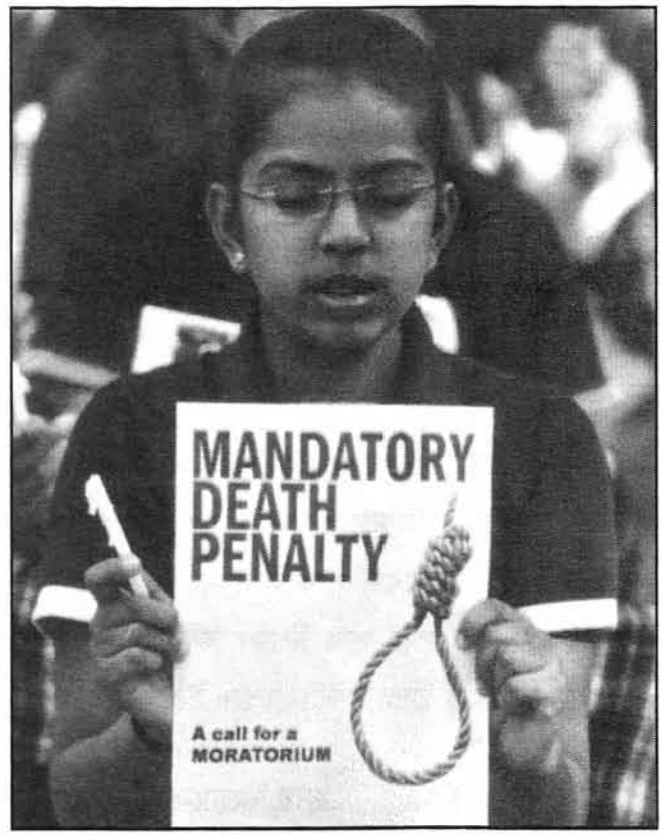

ঘটনাক্রম

১৬ থেকে ২৯শে ডিসেম্বর ২০১২। তেরো দিনে দামিনীর প্রাত্যহিক-শারীরিক অবস্থান এবং পাশাপাশিভাবে রাজধানী দিল্লি ও সারাদেশের প্রতিক্রিয়ার খতিয়ান একনজরে—

১৬ ডিসেম্বর (রবিবার)

● রাত ১০টার আশেপাশে সময়ে ওই অভিশপ্ত ঘটনার সূত্রপাত দিল্লির রাজপথে চলন্ত বাসের মধ্যে।

● গভীর রাতে পুলিশের সহায়তায় প্রথমে এইমস্ হসপিটাল, তারপর সেখান থেকে সফদরজং হাসপাতালের ক্যাসুয়ালটি ডিপার্টমেন্ট এবং পরে হাসপাতালের ইনটেনসিভ্ কেয়ার ইউনিটে দামিনীকে ভর্তি করা হল।

● রাত প্রায় একটায় বসন্ত বিহার পুলিশ থানায় দামিনীর যুবক সঙ্গী অভেন্দ্র পান্ডে এফ.আই.আর দায়ের করেন।

১৭ ডিসেম্বর (সোমবার)

● দামিনীকে প্রথমবার অস্ত্রোপচার করা হল।

● আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা প্রথম এই ঘটনার খবর প্রকাশ করল।

● পুলিশ-সরকারীমহল এবং সমস্ত ভারতীয় সংবাদমাধ্যম (বৈদ্যুতিন এবং সংবাদপত্র) নড়ে চড়ে বসল।

● পুলিশ অপরাধীদের বিরুদ্ধে খুন-ধর্ষণ এবং প্রমাণ লোপ করার মামলা দায়ের করল।

১৮ ডিসেম্বর (মঙ্গলবার)

● দামিনীর শারীরিক অবস্থা আশংকাজনক অবনতির দিকে যেতে থাকে।

● সমস্ত ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমে দামিনীর খবর প্রকাশিত হল।

● উত্তাল হয়ে উঠল রাজধানী, গোটা দিল্লি জুড়ে মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ল।

● চিহ্নিত চার অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল পুলিশ।

● দোষীদের ফাঁসির দাবি জানালেন লোকসভার বিরোধী দলনেত্রী সুষমা স্বরাজ।

১৯ ডিসেম্বর (বুধবার)

● দ্বিতীয়বার অস্ত্রোপচার হল।

● সেদিন অপারেশন থিয়েটারে ঢোকার আগে হাসপাতালে মাকে প্রথমবার দেখতে পেয়েছিল দামিনী।

● তার শারীরীক অবস্থার অবনতির খবরে দেশ জুড়ে বিস্ফোরণ ঘটল। উত্তেজিত জনতা

পুলিশ-থানা, দিল্লি পুলিশের হেডকোয়ার্টার, রাইসিনা হিল্‌সের রাষ্ট্রপতি ভবন সর্বত্র প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠল।

● লোকসভার স্পিকার মীরা কুমার হাসপাতালে দামিনীকে দেখতে যান। তার পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন।

● দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী শীলা দীক্ষিতের বাসভবনের সামনে দামিনীর জন্য বিক্ষোভে সামিল হল দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল ছাত্রছাত্রী। অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি, অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আনতে, জল-কামান ছুঁড়তে হয় পুলিশকে।

● ১৬ ডিসেম্বর দামিনী রাতের ঘটনার জবানবন্দী দিল পুলিশের কাছে।

২০ ডিসেম্বর (বৃহস্পতিবার)

● যৌনাঙ্গ সহ শরীরের বেশ কিছু প্রত্যঙ্গ তখনই স্থায়ীভাবে নষ্ট হয়ে গেছে তবুও শরীরে ক্ষীণ উন্নতির ইঙ্গিত দেখা গেল।

● সারা দেশ জুড়ে সরব এবং নীরব প্রতিবাদী মিছিলে সামিল হল মানুষ।

● সাক্ষী দিলেন প্রত্যক্ষদর্শীরা, নেওয়া হল অভেন্দ্রর বিবৃতি।

২১ ডিসেম্বর (শুক্রবার)

● শারীরিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি। তাকে ভেন্টিলেশান থেকে বের করে আনলেন ডাক্তাররা।

● এদিন দিনভর উত্তাল ছিল রাজধানী। জনতা এদিন বিক্ষোভ দেখায় সুপ্রিম কোর্ট, প্রধানমন্ত্রী দফতর, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এবং দশ নম্বর জনপথ রোডের সামনে। বিভিন্ন নারী সংগঠন ও ছাত্রছাত্রী বিক্ষোভ দেখান ইন্ডিয়া গেট, যন্তর মন্তর, সফদরজং হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকা ও বিজয় চক অঞ্চলে।

● বাকি দুই অভিযুক্তের আরও একজন অভিযুক্তকে চিহ্নিত করল পুলিশ। বিহার ও হরিয়ানায় তল্লাশি চালিয়ে গ্রেফতার করা হল আরও এক অভিযুক্তকে।

২২ ডিসেম্বর (শনিবার)

● তার শরীরের অবস্থা আগের তুলনায় কিছুটা ভালো।

● ১৬ ডিসেম্বর রাতের ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ জবানবন্দী দিল সে সাব ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে এবং সেই বয়ানে কাঁপা কাঁপা হাতে সইও করল।

● সেদিন জনতার প্রতিবাদের তীব্রতা চরমে উঠেছিল। পুলিশ এবং জনতার মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ আহত হন সুভাষচন্দ্র তোমর নামে পুলিশের এক কনস্টেবল। ২৫শে ডিসেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।

● কলকাতা সহ ভারতের বিভিন্ন শহরে ও জেলায় মানুষ মৌন-মুখর নীরব প্রতিবাদে এবং মোমবাতি মিছিলে সামিল হল।

২৩ ডিসেম্বর (রবিবার)

● তার শারীরিক অবস্থা অনেকটাই স্থিতিশীল, যদিও এদিন সারাদিন ধরে বমি হয় তার। ওয়াশ করার জন্য তৃতীয়বার তার শরীরে অস্ত্রোপচার হয়।

● দামিনীর জন্য জনতার বিক্ষোভে কেঁপে উঠল রাজধানী। পুলিশ এবং জনতার মধ্যে সংঘাতের জেরে, এদিন প্রধানমন্ত্রী দুঃখ প্রকাশ করেন।

২৪ ডিসেম্বর (সোমবার)

● এদিন থেকেই তার শারীরিক অবস্থা একটু একটু করে আবার অবনতির দিকে যেতে থাকে। অবশিষ্ট অন্ত্রে আবার সেপসিস বা পচন শুরু হয়।

● এদিনই রাতে ইশারায় বাবার সঙ্গে শেষবারের মতো কথা বলে সে।

● এদিন আবার অস্ত্রোপচার হয় তার।

২৫ ডিসেম্বর (মঙ্গলবার)

● শরীরের অবস্থা মারাত্মক অবনতির দিকে চলে যায় এদিন। আবার তাকে ভেন্টিলেশনে ঢোকানো হয়।

● এদিনও সারাদিন ধরে প্রতিবাদে-বিক্ষোভে ফেটে পড়ে রাজধানীর মানুষ।

২৬ ডিসেম্বর (বুধবার)

● এদিন কয়েক সেকেন্ডের জন্য স্তব্ধ হয়ে যায় তার হৃদযন্ত্র। তাকে সিঙ্গাপুরের মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে নিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

● তিন-তিনবার হার্ট অ্যাটাক হয় তার এদিন।

● এদিন রাতেই তাকে বিশেষ এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয় সিঙ্গাপুর।

২৭ ডিসেম্বর (বৃহস্পতিবার)

● অবস্থা দ্রুত আশঙ্কাজনক অবনতির দিকে যেতে থাকে।

বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিকল হয়ে পড়ছিল ক্রমশঃ।

● বিশ্বমানের আটজন আই সি ইউ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের একটি স্পেশাল টিম আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন তাকে বাঁচিয়ে রাখার।

২৯ ডিসেম্বর (শনিবার)

● ভোর ৪:৪৫ মিনিটে (সিঙ্গাপুরের সময় অনুযায়ী) ভারতীয় সময় অনুযায়ী তখন ২৮ তারিখ রাত ১২টার পর দিন বদল ২৯ তারিখ রাত ২:১৫ মিনিট। অনেক দূরের পথ পাড়ি দিল দামিনী।

● বাঁধ না মানা কান্নায় ভেঙে পড়ল গোটা ভারত।

পরিশিষ্ট

গত ১৬ই ডিসেম্বরের সেই কলঙ্কিত রাতে সভ্যসমাজের বুকে পৈশাচিক ঘটনাটি আমায় স্তব্ধ করে দিয়েছিল। মনস্থ করি এই সামগ্রিক ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করার। সারা দেশকে জানাতে চেয়েছি এক নাগরিকের সামান্য দায়িত্বপালন। দেশের সমস্ত সচেতন মানুষের প্রতিবাদের উত্তাপকে জড়ো করে এক মানবিক আবেদন হোক আমার এই প্রয়াস।

বইয়ের প্রথম সংস্করণ প্রকাশের পরে পাঠকমহলের অভাবনীয় সাড়া পেয়ে আমি অভিভূত। প্রচুর চিঠি, ফোন এবং ই-মেল-এর পাশাপাশি নানা সাজেশনও পেয়েছি।

অল্প সময়ে নিঃশেষিত হল প্রথম সংস্করণ। আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ।

প্রশংসা ও মতামতগুলিতে প্রাণিত হয়ে এই দ্বিতীয় সংস্করণে নতুন আরও তথ্য, ছবি, লেখা সংযোজন করেছি।

আসলে এই বইটি তথাকথিত কোনও মনোরঞ্জনধর্মী সাহিত্যচর্চা বা কাল্পনিক গল্প-কাহিনি নয়। বইটি সম্মিলিত ঘৃণা, লজ্জা ও প্রতিবাদের এক জ্বলন্ত প্রতিফলন হয়ে উঠুক, এই একমাত্র আমার প্রার্থনা।

এই প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে আমি বলতে চেয়েছি, সমাজের এই পঙ্কিল অবক্ষয়, এই অভাবনীয় বিপর্যয় চিরতরে বন্ধ হোক। আমরা যেন দু-পেয়ে জীব নয়, মান-হুঁস নিয়ে 'মানুষ' হয়ে উঠতে পারি। তবেই আমাদের প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ হবে।

তখনই সার্থক হবে আমার এই প্রয়াস।

গভীর অমানিশার মধ্যেও দু-একটি আলোর রেখা এখনই চোখে পড়ছে। অন্তত রাষ্ট্রের তরফে। এবারের বাজেটে মাননীয় অর্থমন্ত্রী চিদাম্বরম নারীদের নিরাপত্তা ও শক্তির বিকাশে ১০০০ কোটি টাকার বিশেষ 'নির্ভয়া তহবিল' ঘোষণা করেছেন। ৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে দামিনীর পরিবারকে দেওয়া হচ্ছে ৩ লক্ষ টাকা মূল্যের 'স্ত্রী শক্তি' পুরস্কার। আবার আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সরকার 'দামিনী'কে জানাচ্ছেন তাঁর আমরণ লড়াইয়ের প্রতি স্যালুট, দিচ্ছেন মরণোত্তর আন্তর্জাতিক 'Woman of Courage' সম্মান।

দামিনী, তুমি আজ এমন দেশে, যেখানে জানি না, আমাদের কণ্ঠস্বর পৌঁছচ্ছে কিনা। তবু বিশ্বাস করতে বড় ইচ্ছে করে, তোমার আলোক-উদ্ভাসিত জ্যোতি, তোমার অপরিমেয় সংগ্রাম, তোমার দুর্জয় সাহস আর অদম্য প্রাণশক্তি যে বৃথা যায়নি, সেটা তুমি অলক্ষ্য থেকে নিশ্চয়ই জানতে পারছ। তোমার সবকিছুর শরিক আমরা, যারা 'মানুষ'!

দামিনী, প্রথম সংস্করণ প্রকাশের আগের দিন গভীর রাতে সহসা তোমায় নিয়ে কয়েকটা সারিবদ্ধ লাইন আমার কলমের ডগায় এসে গেল। এই সংস্করণে যুক্ত করলাম সেই কবিতা বা না-কবিতাকেও।

দামিনী, শুধু তোমারি জন্যে।

শুধু তোমারি জন্য
উত্তাল রাজধানীর আকাশ
শুধু তোমারি জন্য;
শুধু তোমারি জন্য উদাস আকাশের বুক চিরে
রক্ত অক্ষরে লেখা হল
মানুষের প্রতিবাদ।।

শুধু তোমারি জন্য মুখর হল মানুষ
সামিল হল গণ বিপ্লবের জোয়ারে
দেশজুড়ে মহানাগরিকেরা
অশ্রুরুদ্ধ আক্ষেপে বারবার মগ্ন হলেন
বেদনার অনুভবে
শুধু তোমারি জন্য।।

লেখা হল কত কবিতা
কত আহত রচনা ফেসবুকে ট্যুইটারে
কত শত হৃদয়ের যন্ত্রণা
শুধু তোমারি জন্য।।

শত শত নাগরিকের ধিক্কার-লজ্জা-কান্না
হাহাকারের ভাষা হয়ে ছড়িয়ে গেল
আসমুদ্র হিমাচল
শুধু তোমারি জন্য
দামিনী, শুধু তোমারি জন্য।।

সত্যম রায়চৌধুরী

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

- দামিনীর মা আশা দেবী, বাবা বদ্রী সিং পান্ডে, ভাই গৌরব ও সৌরভ।
- বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম।
- সংগৃহীত সংবাদের জন্য গুগ্‌ল, ফেসবুক।
- শোভন চক্রবর্তী।
- তপশ্রী গুপ্ত।
- বৈশালী, অমৃতা, অরূপ, অরিজিৎ, সায়ন্তনী, রণধীর, সুমন্ত, সানন্দা ও আমার সহকর্মীবৃন্দ।
- ত্রিদিবদা ও পত্র ভারতী প্রকাশনার কর্মীবৃন্দ।

এ বই শুধুই একটা বই নয়। কোনো উপন্যাসধর্মী ধারাবাহিক মনোরঞ্জনের উপকরণ নয়। এ বই মানবতার এক চরম বিপর্যয়ের জীবন্ত দলিল। আর্তস্বরের আড়ালে এক সাহসিনীর জীবনযুদ্ধের ছবি। যা থেকে আমরা বিশদে জানতে পারি সেই সাহসিনীকে, আর প্রতিটি মুহূর্তে লজ্জিত হই ধিক্কারে, যন্ত্রণাবিদ্ধ হই শোকে। বইটি পড়ার পর আপনারা আপনাদের মূল্যবান মতামত জানাতে পারেন ই-মেল মারফত patrabharati@gmail.com।

প্রকাশক

এক বর্ণময় চরিত্র। ঝাঁ-চকচকে কর্পোরেট দুনিয়া থেকে ঐতিহ্যমণ্ডিত সাহিত্য সংস্কৃতিমনস্ক বঙ্গ-সমাজ সর্বক্ষেত্রেই সত্যম রায়চৌধুরীর অবাধ বিচরণ।

কর্মসূত্রে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত পূর্বভারতের সর্ববৃহৎ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেকটর।

কিশোর বয়স থেকেই শিল্প ও সংস্কৃতির প্রতি অবিচ্ছেদ্য টান, যার ফলশ্রুতি হিসাবে তিনি এখন পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্য, সংস্কৃতিমহলে এক পরিচিত নাম। তার প্রধান কারণ—সত্যম একজন কৃতী বাচিক শিল্পীও।

সত্যমের লেখকসত্তা তাঁকে বারেবারে প্রণোদিত করেছে নানাবিধ সৃজনশীলতায়। ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য বিষয়ে তাঁর সংকলিত বিভিন্ন গ্রন্থ পাঠকমহলে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে। রচিত গ্রন্থ 'কবিতীর্থ বিলেত'।

প্রচ্ছদ **মানস চক্রবর্তী**

“ দামিনী কোনও একটি মেয়ের নাম নয়। নির্ভয়া কোনও একটি মেয়ের নাম নয়। জ্যোতিও কেবলমাত্র একটি মেয়ের নাম নয়। অসহায়ভাবে নরপশুদের লালসার শিকার হয়েও দুনিয়ার যে মেয়ে লড়তে লড়তে প্রাণ হারায়, সে-ই তো দামিনী, নির্ভয়া কিংবা জ্যোতি। তাদের যন্ত্রণার কথা, অসহায়ভাবে মরে যাওয়ার কথা, অত্যন্ত সমবেদনার সঙ্গে সত্যম রায়চৌধুরী তুলে ধরেছেন তাঁর লেখনীতে। সাম্প্রতিক দিল্লি গণধর্ষণ কাণ্ডের যেন একটি দলিল রচনা করেছেন তিনি। মূর্ত হয়ে উঠেছে অকালে জীবনদীপ নিভে যাওয়া মেয়েটির স্বপ্নভঙ্গের কাহিনি।... ”

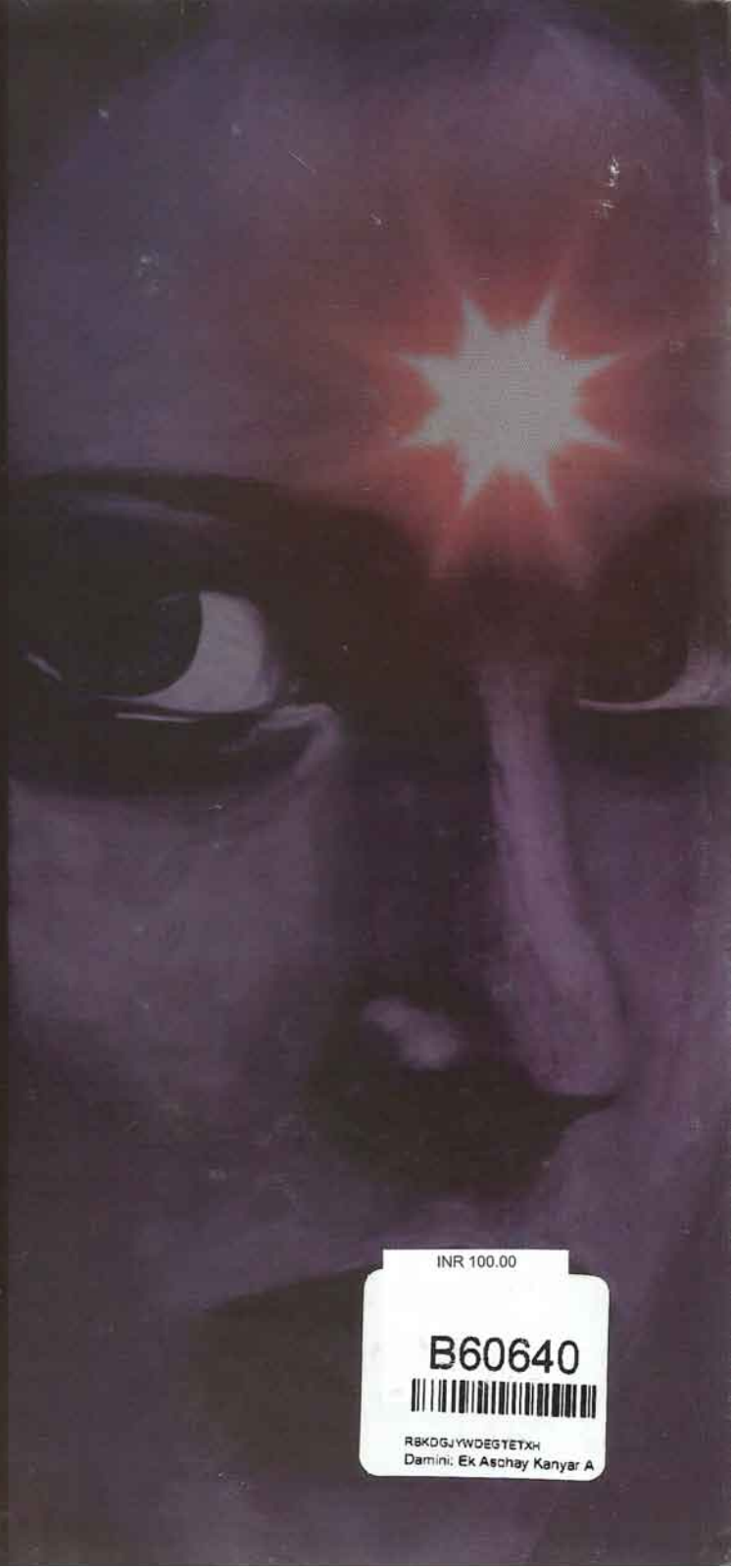

INR 100.00
B60640
R8KDGJYWDEGTETXH
Damini: Ek Aschay Kanyar A

সত্যম রায়চৌধুরী

দামিনী

পত্র ভারতী